ব্যান্ডেজ

–এমএস ইসলাম বারীক

১৯৯০ সাল। স্বৈরশাসক এরশাদ শাহী ক্ষমতায়। কিন্তু মিছিল– মিটিংয়ে লোক সমাগম নৈরাশ্যজনক। টাকা দিয়েও লোক আনা যায় না। এমন অবস্থায় নজর পড়ে স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের প্রতি। যারা মিটিংয়ে যেতে অনিচ্ছুক তাদের প্রতি নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। তাই অধিকাংশ ছাত্র কলেজে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

প্র্যাকটিকাল ক্লাস থাকায় যাবো না, যাবো না করেও সেদিন কলেজে গেলাম। তারিখ ও মাসের নাম এ মুহূর্তে ভুলে গেছি বলে দুঃখিত।

কলেজে ঢুকেই শুনি আজ আর ক্লাস হবে না। শুনে মনে মনে এরশাদের চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করি। পালানোর পথ খুজছি। কিন্তু কোনো পথ নেই। কারণ একটি গেট। গেটে সন্ত্রাসী গোষ্ঠি ঢুকতে দিচ্ছে। কিন্তু বের হতে দিচ্ছে না। প্রতিটি রুমে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের বের করছে আর তালা মেরে দিচ্ছে। লুকানোর জায়গা নেই। অগত্যা জানোয়ারদের সহযাত্রী হতে হলো।

বসেছি বাসের দরজার কাছে, যাতে সুযোগ পেলেই নেমে যেতে পারি। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি। বাসে উঠিয়েই গেট লক, পাশেই ছাত্রসমাজের পাণ্ডার পাহারা। মিটিং হচ্ছে কাকরাইলে। অবশেষে পালানোর আশা বাদ দিয়ে এলাম কাকরাইলের *রাজমণি সিনেমা* হলের সামনে।

অন্য বাসগুলোর জন্য অপেক্ষা করছি। এমন সময়ে সিনেমা হলের বিপরীতে ফুটপাথে ঘটলো সম্ভবত ককটেলের বিস্ফোরণ। মনে মনে এমন কিছুর অপেক্ষায় ছিলাম, শব্দ হওয়া মাত্রই দে ছুট। ছুটছি তো ছুটছি।

পেছনে পুলিশ ও ছাত্রসমাজের ক্যাডার। ওরা ভাবছে ককটেল আমরা ফাটিয়েছি। ধরতে পারলে রক্ষা নেই। পেছনে তাকানোর সময় নেই।

পায়ের স্যানডাল যে কোথায় খুলে গেল টেরই পেলাম না। স্যানডাল ছাড়া দৌড়াতে গিয়ে পায়ের বারোটা বেজে গেল। তবুও দেয়াল টপকিয়ে ঢুকে পড়লাম এক বাড়িতে। পুলিশ ওই বাড়ির গেটে ধুমধাম পেটাচ্ছে। দুজন বিপরীত দিকের দেয়াল টপকিয়ে পগার–পার।

আমি অসহায়। একে তো পা কেটে প্রচুর রক্ত বের হচ্ছে, তার উপর জ্বর। কিছু ভাবতে পারছি না। হঠাৎ মনে হলো স্বর্গ থেকে নেমে এলো কোনো ডাকাকাটা পরী। আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল তার রুমে। শুইয়ে দিল বিছানায়। এমন সময় কাজের মেয়ে ওনাকে এক কাপ চা দিয়ে গেল। ঠিক ওই সময়ে নিচে গেট খোলার শব্দ। তিনি চায়ের কাপটা হাতে দিয়ে বাথরুমের জানালা দিয়ে অবস্থা বুঝতে চাইলেন। বুঝলেন অবস্থা খারাপ, রক্তের দাগ দেখে এগিয়ে আসছে পুলিশ।

ওই সময়ে একটি আপেল হাতে নিয়ে কেটে ফেললেন নিজের হাত। তারপর রুমাল প্যাচিয়ে চলে গেলেন পাশের রুমে। দুই তিন মিনিট পরই পুলিশ দরজায় হাজির। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়, আর বুঝি রক্ষা নেই। চায়ের কাপ হাতেই খুড়িয়ে দরজা খুললাম। আমার অবস্থা তখন শোচনীয়।

আবারও রক্ষা করলো সেই মেয়ে। নিজের কাটা হাতটি সামনে এনে দেখিয়ে চিৎকার শুরু করলেন। রহিমার মা, তোমাকে না বলেছি, ওকে চা দিও না, তবুও তুমি শুনলে না, অসুস্থ মানুষটাকে চা দিলে আবার। এদিকে আমি যে স্যাভলন চাইলাম সেদিকে খেয়াল নেই। বলেই হাতের রুমালটা সরালেন। তখনি নেমে এলো রক্তের ধারা।

পুলিশ ব্যাটার তো মাথা খারাপ হবার অবস্থা। সরি বলে পাণ্ডাসহ চলে গেল।

মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানালাম।

ওই সময়ে পাশের রুম থেকে এলেন মেয়েটির মা। মেয়েটিকে বললেন, বন্যা, তুই অভিনয় করলেই পারতিস, এতোদিনে সেরা অভিনেত্রী হতে পারতিস। তারপর যে প্রাণখোলা হাসি দিলেন।

এতোক্ষণের দুঃশ্চিন্তা আর পায়ের ব্যথা সব ভুলে গেলাম। মনে হলো এ তো আমারই মা। তারপর সযত্নে আমার পা এবং বন্যার হাতে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিলেন।

এরপর পরিচয়।

আমার পরিচয় দিলাম। তারপর শুনলাম তাদের পরিচয়।

মেয়েটি ইডেনে পড়ে ফার্স্ট ইয়ারে। মা-বাবা উভয়েই ডাক্তার।

আজ এতো বছর পরও যদি কখনো ওদের বাসায় যাই তখনি খালাম্মা বলে ওঠেন, এই কে আছিস, এক কাপ চা দিয়ে যা।

আমি আর বন্যা এক সঙ্গে হেসে উঠি। বন্যা এখন আমার প্রাণস্পন্দন।

বকশিবাজার, ঢাকা থেকে

সুন্দর কাপে

–সোমা

একটা চায়ের কাপ আর পিরিচ যে কতো দামি হতে পারে, আমেরিকায় আসার আগে তা নিয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

আমার সব সময়ই শখ কাচের সুন্দর বাসন-কোসনের আর সুদৃশ্য কাপ। এ দেশে ভালো কাচের জিনিস, বিশেষত বোন চায়না (Bone China) খুব এক্সপেনসিভ। ডিনার সেট তো স্বপ্নের মতো। কারণ উন্নতমানের পুরো সেট এক সঙ্গে বিক্রির বদলে এখানকার দোকানে বেশির ভাগ সময় সব ডিশ খুচরো বিক্রি হয়। তার দাম দেখলে ভয়ে হাত দিই না।

একটা কাপ পিরিচ যদি মোটামুটি কোয়ালিটির পছন্দ করি তাহলে শপিং মল বা নামকরা বড় দোকানগুলোতে সত্তর আশি ডলার থেকে শুরু। যদি খুব ভালো বোন চায়না হয় তাহলে তো একটা কাপ পিরিচ দেড়শ ডলার কোনো ব্যাপারই না। পাঠক, এবার আমেরিকান ডলার থেকে এই দাম বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট করে দেখুন তা কতো হতে পারে?

কিছু দিন আগে আমার মা আমাদের দ্বিতীয় বাচ্চা হওয়া উপলক্ষে বেশ লম্বা একটা ট্রিপ দিয়ে গেলেন আমাদের কাছে। আম্মা এখানে আসার আগে আমার ছোট ভাইয়ের নতুন বৌ জানতে চেয়েছিলেন কি গিফট দিলে আমি পছন্দ করবো।

আম্মা জানেন, আমার সুন্দর চায়ের কাপের খুব শখ। তাই জেনে আমার ভাইয়ের বৌ খুব সুন্দর একটা টিসেট আম্মার হাতে করে পাঠালো।

আমি তো ভীষণ খুশি। ঠিক যেমন ধরনের পছন্দ করি তেমনি। এখানকার অনেক চায়ের কাপ হলো সিলিন্ডার আকৃতির, ছোট। দেখে মনে হবে যেন বড় কফি মগের মিনি ভার্শন। এসব আকৃতির কাপ আমার অসহ্য! দেশে আমরা যেসব কাপে চা খাই, উপরের দিকটা চওড়া, আর নিচে একটু কম, সেগুলোই এখানে বেশ ভালো দাম। আর আমার পছন্দের। আম্মা যত্ন সহকারে আমার হাতে পৌছে দিলেন। এখন অতিথি এলে বের করি। প্রথম প্রথম ক্যাবিনেট খুলে তাকিয়েও দেখতাম! ঠিকঠাক আছে তো?

পার্টি শেষে ভুলেও অতিথিদের দিই না ধুতে। পারতপক্ষে কাউকেই দিই না। আবার আমার এতো সাধের চায়ের কাপ যদি কেউ হাত ফসকে ভেঙে দেয়! চা আমিই বানিয়ে দিই, স্বামীকে দিই না। সে সময় বাচাতে মাইক্রোওভেনে দেবে তাহলেই যাবে সোনালি বর্ডার পুড়ে!

পার্টি শেষে সব কিছু ডিশওয়াশারে দেয়ার আগে প্রথমেই যত্ন নিয়ে আমার প্রিয় কাপগুলো ধুয়ে নিই। ধীরে ধীরে। একটা একটা করে যেন সদ্যজাত শিশু, খুব ধীরে, একটুও তাড়াহুড়ো করা যাবে না। সাবানে হাত ফসকে গেলেই শেষ!

আমাদের অনেক বন্ধুরাই বাংলাদেশে বেড়াতে গেলে মুন্নু বা শাইনপুকুরের কাচের জিনিস আমার অনেক শখ আর অমনি যত্ন করে নিয়ে আসে। আমরা জানি কতো অমূল্য এগুলো এখানে।

টক শো হোস্ট ওপরা উইনফ্রে-কে অনেকেই চেনেন। প্রতি শো শেষ হওয়ার পর ওপরা রিলাক্স করে তার ক্রুদের নিয়ে সুন্দর একটা কাপে চা খায়। তার মতে, সুন্দর কাপের চা কোনো অজানা কারণে মধুর হয়। আমিও তার সঙ্গে একমত।

বাসায় পার্টির শেষলগ্নে সবার হাতে এক কাপ গরম ধোয়া ওঠা, পারফেক্ট রঙ ঘনত্ব আর খুশবুদার চা এবং সবাই মিলে আড্ডার চেয়ে ভালো কি হতে পারে?

তবে মজার ব্যাপার হলো, আমি নিজে চা খাই না। আমার সমস্ত আনন্দ আমাদের বন্ধুদের সুন্দর কাপে পারফেক্ট চা খাইয়ে!

ডালাস, টেক্সাস থেকে

লবণ ও হাফ গ্লাস সোডা

–হোসেন তৌহিদ জুয়েল

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আরমান গুরুগম্ভীর গলায় বললেন, বুঝলেন, এ রিপাবলিকানদের জন্যই দেশের এ অবস্থা। দেখেছেন গ্যাসের (পেট্রলের) দাম কি হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে?

মিজান আরমানকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে রাখেন তো আপনার এ রিপাবলিকান আর ডেমোক্রেটদের নিয়ে প্যাচাল। বুঝলাম হয়তো আমরা এখন এ দেশের সিটিজেন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, আমাদের আসল দেশ হলো বাংলাদেশ। চা খেতে খেতে যদি পলিটিকাল ব্যাপারে আড্ডা দিতে হয় তাহলে বাংলাদেশের পলিটিক্স নিয়েই চলুন আড্ডা দিই।

টেবিলে বসে থাকা রহমান আর সাইদুলও মিজানকে সায় দিয়ে বললো, ঠিকই বলেছেন মিজানভাই।

সাইদুল তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বললো, চা খেতে খেতে বাংলাদেশের পলিটিক্স নিয়ে আলোচনার চেয়ে আনন্দের আর কিছুই হতে পারে না। তারপর একটু থেমে বললেন, ইশ, যদি পিরিচে ঢেলে ফু দিয়ে চা-টা খেতে পারতাম তাহলে আরো ভালো লাগতো। মাগার, আমেরিকানরা যে কি! চা খাবার জন্য তারা কি না একটা প্লাস্টিক কাপ ব্যবহার করে শুধু। পিরিচের মধ্যে চা ঢেলে খাবার যে মজাটা, এটা এ জাতি বুঝলোই না আজ পর্যন্ত।

রহমান হেসে বললো, আরে পিরিচে চা ঢেলে খাওয়া তো পরের কথা। আমেরিকাতে সত্যিকারের গরম চা কতোজনই বা খায়। সব জায়গাতেই শুধু কফি, আইসড টি, ক্যাপুচিনো আর হট চকলেটের ছড়াছড়ি। আমাদের সৌভাগ্য যে, এ দোকানে অন্তত এগুলোর পাশাপাশি গরম চা-ও পাওয়া যাচ্ছে।

মিজান মাথা নাড়িয়ে বললেন, হ্যা, একদম ঠিক বলেছেন। আর এ চা-টার স্বাদও বেশ ভালো লাগছে। তবে সাইদুল, আমি তোমার সঙ্গে এক মত। পিরিচে ঢেলে চা খেতে পারলে আরো ভালো লাগতো। দেখি নেক্সট টাইম কোথাও চা খেতে গেলে একটা পিরিচ নিয়ে যাবো। তারপর সেই পিরিচে ঢেলে ঢেলে চা খাবো।

অন্যরা মিজানের কথা শুনে হাসলেন।

আরমান চা-য়ে চুমুক দিয়ে আবার শুরু করলেন পলিটিকাল আলাপ। বুঝলে, বিএনপি তো পুরো দেশটাকে একদম শেষ করে দিচ্ছে।

মিজানের কথা শেষ না হতেই আরমান বলে বসলেন, আর আওয়ামী লীগ তো হরতাল করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েও যে হারে হরতাল ডেকে ডেকে দেশের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে ...।

হরতাল ডাকার মধ্যে দোষের কি আছে? হরতাল তো গণতান্ত্রিক অধিকার, একটু বিরক্ত হয়ে আরমান বললেন।

ঠিক আছে, হরতাল যখন গণতান্ত্রিক অধিকার তাহলে বসে আছেন কেন? কালকেই টেক্সাসে আপনারা যারা আওয়ামী লীগের ঘোর সমর্থক আছেন তারা একটা হরতাল ডেকে দিন। বলুন যে এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার।

আরমান একটু ক্ষিপ্ত হয়ে কি একটা বলতে গেলেন। অমনি ওনার হাত থেকে প্লাস্টিকের চায়ের কাপটি উল্টে গেল। কাপের বাকি অর্ধেক চা-র পুরোটাই আরমানের পাশের চেয়ারটিতে গিয়ে পড়লো। তিনি একই সঙ্গে হতভম্ব আর বিব্রত।

মিজান, সাইদুল এবং রহমানও এমনভাবে আরমানের দিকে তাকালেন যেন মস্ত বড় এক অন্যায় করে ফেলেছেন তিনি।

একজন ওয়েটারের চোখে সে দৃশ্যটি পড়তেই সে ছুটে এলো। আমেরিকানদের চোখ-মুখে সর্বদা হাসি থাকে। এ ওয়েটার ব্যাটার মুখেও হাসি। ওয়েটার আরমানের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, ওহ, ডোন্ট ওয়ারি স্যার, আই উইল টেক কেয়ার অফ ইট (কোনো সমস্যা নেই, আমি দেখছি)।

আরমান অবশ্য খুব একটা ভরসা পেলেন না। হাসিমুখে ব্যাটা বলছে টেক কেয়ার করবে, পরে হয়তো দেখা যাবে কোথা থেকে আরমান সাহেবের ক্রেডিট কার্ডে একটি বাড়তি বিল ঝুলিয়ে দেবে। আরমান বিরস মুখে ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ওয়েটার অবশ্য চুপচাপ দাড়িয়ে নেই। সে খুব দ্রুত ভেতরে চলে গিয়ে ফিরে এলো। এক হাতে একটি পটের মধ্যে কি যেন, আরেক হাতে একটি গ্লাস। তার অর্ধেকটা সোডায় পূর্ণ।

আরমানকে অবাক করে দিয়ে ওয়েটার চেয়ারের যে অংশে চা পড়েছিল সেখানে সোডা ঢেলে দিল।

আরমান অবাক হয়ে বললেন, হেই ম্যান, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং (তুমি কি করছো এটা)?

ওয়েটার হাসিমাখা মুখে বললো, স্যার, এটা হলো আমাদের পুরনো একটি রেস্টুরেন্ট ট্রিক। চা কিংবা কফির দাগ কোনো চেয়ার বা কাপড় জাতীয় কিছুর মধ্যে পড়লে সেটি নিমেষেই দূর করে দেবার বেস্ট উপায় হলো সল্ট আর হাফ গ্লাস সোডা। এই যে আমি এখানে সোডা ঢাললাম, এখনই আমি এর ওপরে লবণ ঢালছি। বলেই হাতের পটটি থেকে অনেকখানি লবণ ঢেলে দিল সেখানে। তারপর একটি তোয়ালে চেপে ধরলো। এরপর বললো, এভাবে দুই মিনিট চেপে রাখতে হবে। তারপর নিমেষেই চায়ের দাগটি পুরোপুরি হারিয়ে যাবে। চায়ের কোনো চিহ্নই থাকবে না।

আরমান বিড়বিড় করে বললেন, ওয়াও, অ্যামেইজিং।

কয়েক মিনিট তোয়ালে দিয়ে জায়গাটুকু চেপে রাখার পর ওয়েটারটি যখন টাওয়েলটি সরালো তখন আরমান অবাক হয়ে দেখলেন যে, সেখানে চায়ের দাগের কোনো চিহ্নই নেই।

তিনি আরো একবার বিড়বিড় করে বললেন, রিয়ালি অ্যামেইজিং।

তারপর সেখানে বসে আরো কিছুক্ষণ আড্ডা দিলেন আরমান অন্যদের সঙ্গে। কিন্তু তার মাথায় সারাক্ষণ সেই হাফ গ্লাস সোডা আর লবণ দিয়ে চায়ের দাগ দূর করার ট্রিকটি ঘুর ঘুর করতে লাগলো।

তিনি মনে মনে ভাবলেন, বাসায় গিয়ে নায়লাকে ট্রিকটা সম্পর্কে বলতে হবে। নিশ্চয় খুব অবাক হবে নায়লা। ইশ, এ ট্রিকটি যদি তার আগে জানা থাকতো! গত মাসে হঠাৎ একবার ডাইনিং টেবিলের টেবিলক্লথটির ওপর অ্যাক্সিডেন্টালি চা ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। নায়লা বেচারী রাগ করে টেবিলক্লথটিই ফেলে দিয়েছিল। তখন

যদি টেকনিকটি জানা থাকতো তাহলে নিশ্চয় টেবিলক্লথটি ফেলে দিতে হতো না। বরং সোডা আর লবণ দিয়ে পুরো চায়ের দাগ তিনি নিমেষেই দূর করে দিয়ে নায়লাকে অবাক করে দিতেন।

যাই হোক। দেরিতে হলেও একটা কাজের জিনিস শেখা গেছে।

বাড়িতে ঢুকেই আরমানের মেজাজটা খারাপ না হয়ে পারলো না। ড্রয়িংরুমের মধ্যে নায়লার সঙ্গে বসে আছে রাশেদ। এ রাশেদ ছেলেটাকে মোটেই সুবিধার মনে হয় না আরমানের। ভাবী ভাবী করে শহরের সব বাঙালি ম্যারেড মেয়েদের বাসায় ঘুর ঘুর করা এ ছেলেটার কাজ। আরে ব্যাটা, নিজে একটা বিয়ে কর, তারপর তোর বাড়িতে যখন তোর অবর্তমানে কোনো চ্যাংড়া পোলা এসে ভাবী ভাবী করে আড্ডা দিয়ে বেড়াবে তখন বুঝবি কেমন লাগে।

আরমানকে দেখেই একটু যেন হালকা ধরনের থতমত খেয়ে বসলো নায়লা আর রাশেদ।

নায়লা উঠে হাসিমুখে সহজভাবে বললো, এই দেখো, কে এসেছে।

আরমান সহজ হবার ভঙ্গি করে হাসিমুখে বললেন, আরে রাশেদ, কেমন আছো? কখন এলে?

রাশেদ ভদ্রসুলভ একটা হাসি দিয়ে বললো, এই তো এলাম কিছুক্ষণ হলো। ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে একটু দেখা করে যাই। তাছাড়া সামনের মাসে দেশে যাচ্ছি।

আরমান একটু উদাস গলায় বললেন, ও, তাই নাকি?

জি জি। তাছাড়া বয়স তো হলো। চাকরিতেও মোটামুটি সেটলড হয়ে গেছি। ভাবছি এবার দেশে গিয়ে একটা বিয়ে করে আসবো।

আরমান এ কথাটি শুনে যেন একটু খুশি হলেন। মনে মনে বললেন, যাক বাবা, বাচা গেল। তোমার বিয়েটা হয়ে গেলে আশা করি স্বামীদের অবর্তমানে ভাবীদের বাসায় ঘোরাঘুরির অভ্যাসটি দূর হবে।

এমন সময় চা হাতে নায়লা ড্রয়িংরুমে ঢুকলো। নায়লার হাতে চা দেখেই আরমানের সেই লবণ আর সোডা দিয়ে চায়ের দাগ দূর করার ঘটনাটি মনে পড়লো। আরমান উৎসাহ নিয়ে বললেন, এই, তোমাদেরকে একটা গল্প বলি। আজকে একটু খুব ইন্টারেস্টিং ও কার্যকরী জিনিস শিখলাম।

নায়লা তেমন উৎসাহ দেখালো না।

রাশেদ হাসিমুখে বললো, তাই নাকি? কি সেটা?

আরমান পুরো ঘটনাটা খুব উৎসাহ নিয়ে খুলে বললেন।

রাশেদ হেসে বললো, ওয়াও! বলেন কি? সত্যি নাকি? আমি সত্যিই অবাক হয়েছি। ভারী মজার একটা জিনিস জানা হলো।

আরমানও হাসলেন। নায়লার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি খুব ইন্টারেস্টিং, তাই না?

নায়লা কিছু বললো না। বিরক্তি সহকারে যেন একটু মুখটা বাকা করলো।

রাশেদ আবারও হেসে বললো, দারুণ ইন্টারেস্টিং।

এর বেশ কয়েকদিন পরের ঘটনা। অস্টিনের এক বাঙালি পার্টিতে আরমান ভিড়ের মধ্যে একা দাড়িয়ে চা খাচ্ছিলেন। চারদিকে অনেক লোক। দিন দিন অস্টিনে বাঙালিদের সংখ্যা যে কতো বেড়ে যাচ্ছে তা কোনো বাঙালি পার্টিতে গেলেই বোঝা যায়। ছয় সাত বছর আগেও কোনো বাঙালি অনুষ্ঠানে এতো ভিড় দেখা যেতো না। অতিথিদের সবাই কম বেশি চেনা পরিচিত ছিল। আর এখন এতো ভিড় হয় যে, ভিড়ের মাঝে অপরিচিত মুখই বেশি, চেনা পরিচিতদের খুজেই পাওয়া যায় না।

এর মধ্যে হঠাৎ করে তিনি মিজানকে দেখতে পেলেন। দেখলেন মিজান পিরিচের মধ্যে চা ঢেলে খাচ্ছেন।

আরমান এগিয়ে গিয়ে বললেন, আরে মিজান সাহেব, আপনি কেমন আছেন? যাক, এ ভিড়ের মধ্যে পরিচিত একজনকে খুজে পেলাম। তা আপনি দেখি পিরিচে ঢেলে মনের আনন্দে চা খাচ্ছেন। এ প্লেট পেলেন কোথায়?

মিজান পেছনের দিকে একটি টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওই যে টেবিলটি দেখতে পাচ্ছেন, মেয়েরা দাড়িয়ে আছে। ওখানে অনেকগুলো এম্পটি চায়ের কাপের প্লেট আছে। যান নিয়ে আসুন। পিরিচে ঢেলে চা খান। মজা পাবেন।

আরমান সাহেব এগিয়ে গেলেন। তবে টেবিলের সামনে গিয়ে তিনি যেন বিব্রত বোধ করা শুরু করলেন। পুরো টেবিলটি ঘিরে আছে একগাদা মেয়ের দল। তাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে প্লেট আনা তার উচিত হবে কি হবে না ভাবছেন। এমন সময় এতোগুলো মেয়ের মাঝে হঠাৎ করে চোখে পড়লে রাশেদকে। চারটা মেয়ের মাঝে দাড়িয়ে ভাবী ভাবী করে কিসব গল্প করছে যেন। আরমান মনে মনে বললেন, ব্যাটা একদম জায়গা মতো দেখি দাড়িয়ে আছে। আস্ত খবিশ!

তিনি হাসিমুখে রাশেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই রাশেদ কেমন আছো? শোনো। তুমি যে টেবিলের সামনে দাড়িয়ে আছো সেখান থেকে একটা প্লেট আমাকে দিতে পারবে, চায়ের প্লেট?

রাশেদ টেবিল থেকে একটি প্লেট নিয়ে এক মহিলার মাথার ওপর দিয়ে আরমানকে দিতে যাচ্ছিল, ঠিক এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এক ছোট্ট ছেলে দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে আরমানের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেল। অমনি আরমানের হাতের কাপটি থেকে অনেকখানি চা ছিটকে গিয়ে পড়লো ভিড়ের মধ্যে দাড়িয়ে থাকা এক মহিলার শাড়ির ওপর।

মহিলা বিরক্ত হয়ে আরমানের দিকে তাকালেন।

আরমান খুবই লজ্জিত হয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন, ইয়ে মানে, আমি খুবই দুঃখিত।

মহিলা খুবই বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, ও নো! আমার একদম নতুন শাড়ি।

আরমান সত্যিই খুব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। চেনা পরিচিত কোনো মহিলা হলেও হয়তো কথা ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মহিলা। বেচারী তার শাড়ির ওপর চায়ের অনেকখানি পড়ে গেছে। ঠিক এমন সময় আরমানের মাথায় এলো সেই হাফ গ্লাস সোডা আর সল্টের টেকনিক। তার এখন দরকার সোডা, সল্ট আর একটি টাওয়েল বা পরিষ্কার কোনো কাপড়। পার্টিতে সার্ভ করা শাদা ধবধবে রুমালটি দিয়েই কাজ হবে, মনে মনে ভাবলেন তিনি।

আশপাশে তাকাতেই রাশেদের হাতে একটি সোডার গ্লাস দেখতে পেলেন। তিনি সেটি রাশেদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, এই রাশেদ, তুমি একটা কাজ করো। দেখো, কোথা থেকে এক মুঠো লবণ নিয়ে আনতে পারো কি না। হারি আপ।

আরমান সেই শাড়িতে দাগ পড়া মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাবী, আমি এক্সট্রিমলি সরি। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এখনি আপনার শাড়ি থেকে চায়ের দাগ ভ্যানিশ করে দেয়ার ব্যবস্থা করছি।

কথাগুলো বলেই তিনি তার হাতের গ্লাসটি থেকে বেশ খানিকটা সোডা ঢেলে দিলেন মহিলার গায়ে বা তার শাড়ির সেই অংশটির ওপর। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে রাগে কটমট করে বললেন, হোয়াট দি হেল? তামাশা করছেন আমার সঙ্গে? আমেরিকাতে এসেও মেয়েদের গায়ে পানি, চা, এসব ঢালার বদঅভ্যাস এখনো যায়নি?

আরমান পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলেন। আশপাশের সবাই তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আরমান একটু ভীতু গলায় বললেন, না মানে, আমি আসলে একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করছিলাম আপনার কাপড় থেকে চায়ের দাগ ক্লিন করার জন্য ...।

আরমান তার কথা আর শেষ করতে পারলেন না। সেই মহিলা এবার হুংকার দিয়েই যেন বললেন, শাট আপ। আমার সঙ্গে টাউটগিরি? আপনার সৌভাগ্য যে, আমার স্বামী আজকে এখানে নেই। যদি সে এখানে থাকতো তাহলে বুঝতেন *কত ধানে কত চাল*। মেয়েদের গায়ে পানি, চা ঢালার অভ্যাস আমেরিকাতে এসেও যায়নি, না? ইডিয়ট ...।

আরমান পুরোপুরি বিব্রত। কি বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

রাশেদ টেনে আরমানকে অন্যদিকে নিয়ে গিয়ে বললেন, ছিঃ ছিঃ এটা কি করলেন আরমানভাই?

আরমান বললেন, কেন রাশেদ, আমি সেদিন তোমাকে বলেছিলাম না সোডা আর সল্ট দিয়ে চায়ের বা কফির দাগ ইন্সটান্টলি দূর করার একটা টেকনিক শিখেছি। ওটাই তো অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছিলাম।

রাশেদ বললো, তা হয়তো বুঝলাম। তাই বলে অপরিচিত একজন বাঙালি মহিলার শরীরে পড়ে থাকা কাপড়ের ওপর এ টেকনিকটি প্রয়োগ করা যে কতোটা ভয়াবহ সেটা কি টের পেয়েছেন এখন?

আরমান ইতস্তত করে বললেন, বুঝতে পেরেছি, এটা ভুল হয়ে গেছে।

রাশেদ মৃদু হেসে বললো, এই তো লাইনে এসেছেন। পরিচিত কেউ যদি হতো তাহলে হয়তো তার ওপর এমন কিছু প্রয়োগ করে তাকে বুঝিয়ে বললে একটা কথা ছিল। কিন্তু অপরিচিত কোনো মহিলাকে ... বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়।

বেশ কয়েকদিন পরের কথা। কোনো এক সুন্দর উইকএন্ডে আরমান তার স্ত্রী নায়লাকে নিয়ে সকালের দিকে বের হলেন। অস্টিনের একটি সুপরিচিত ইনডিয়ান রেস্টুরেন্টে বসে চায়ের অর্ডার দিলেন। অমনি কোথা থেকে এসে উদয় হলো রাশেদ। রাশেদকে দেখে আরমান বিরক্ত হলেন। তবে মুখের মধ্যে হাসি ফুটিয়ে বললেন, তুমি এখানে? এসো, বসো, আমাদের সঙ্গে এক কাপ চা খাও।

আরমানের মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল রাশেদ হয়তো বলবে, না না, আজ না, আরেকদিন।

তবে রাশেদ সে রকম কিছুই বললো না। চা খাবার নিমন্ত্রণ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়ে নায়লার পাশের একটি চেয়ারে গিয়ে বসলো।

আরমানের হাসি নিমেষেই মলিন হয়ে গেল।

এক সময় চা এলো। সঙ্গে ভেলপুরী।

আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিতেই হঠাৎ করে পেছন থেকে কে যেন এসে আরমানের সামনে এসে দাড়িয়ে পরিষ্কার বাংলা বললেন, আপনিই সেই লোক?

আরমান অবাক হয়ে লোকটির দিকে তাকালো। কে এই লোক? ঠিক চিনতে পারছি না।

নায়লা আর রাশেদও অবাক হয়ে লোকটির দিকে তাকালো।

আরমান অবাক হয়ে বললেন, আপনি কে ভাই?

লোকটি রাগান্বিত স্বরে বললেন, আমি কে? আমি কে সেটা একটু পরেই টের পাওয়াচ্ছি। কথাগুলো বলেই লোকটি কিছুটা দূরের টেবিলে বসে থাকা এক মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই সোনিয়া, ভালো করে দেখে বলো। এই কি সেই লোকটা নাকি যে তোমার শাড়িতে চা আর সোডা ঢেলেছিল?

আরমান এবার ভ্রূ কুচকে মহিলার দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢোক গিললেন। আরে ওই দিনের ওই মহিলা দেখি এখানে? এই লোকটা কে তাহলে? মহিলার হাজব্যান্ড নাকি?

আরমান কিছু বলার আগেই দূরের ওই টেবিলে বসে থাকা মহিলা চেচিয়ে বললেন, হ্যা, এই ওই দিনের ওই পার্টির পাজি লোকটা।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা যেন বজ্রমূর্তি ধারণ করলো। হুংকার দিয়ে বললো, এতো বড় সাহস, আমার বৌয়ের গায়ে চা, সোডা ঢালিস। আজকে মিয়া তোমার একদিন কি আমার একদিন।

আরমান বেশ ভালোই ঘাবড়ে গেলেন। লোকটিকে বোঝানোর চেষ্টা করে বললেন, প্লিজ, আপনি ঘটনাটা আগে শুনুন। প্রথমে অ্যাক্সিডেন্টালি চা-টা আপনার স্ত্রীর শাড়িতে পড়ে গিয়েছিল। আমি বরং শাড়ির মধ্যে থেকে চায়ের দাগ তোলার জন্য সোডা আর লবণের একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করেছিলাম।

লোকটা এবার হুংকার দিয়ে বললো, দুর মিয়া। আমার লগে চাপাবাজি? দাড়াও মিয়া, আজকে তোমার একদিন কি আমার একদিন। কথাগুলো বলেই লোকটি আরমানের শার্টের কলার ধরে টেনে দাড় করালো।

আর তখনই আরমান সাহেবের হাত থেকে চায়ের কাপটি ছিটকে পড়ে গেল। এবং চায়ের অনেকখানি গিয়ে পড়লো পাশে বসে থাকা নায়লার ঠিক বুকের ওপর।

আরমান মাথা ঘুরিয়ে নায়লার দিকে তাকালেন। ইশ, বেচারী তার নতুন কেনা ড্রেসটার ঠিক সামনের অংশের বেশ কিছু জায়গা জুড়ে চা পড়েছে। আরমান কি করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

নায়লাও মহা বিরক্ত। কিন্তু কি করবে বুঝতে পারছে না।

আরমান লোকটির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করছেন। তবে সুবিধা করতে পারছেন না। ওই লোকটির বয়স কম। শরীরও পালোয়ান মার্কা।

ঠিক এমন সময় লাফ দিয়ে উঠে রাশেদ চেচাতে লাগলো, হাই ওয়েটার, তাড়াতাড়ি সোডা আর লবণ দাও – হারি আপ?

আরমান লোকটির সঙ্গে ধস্তাধস্তির কথা ভুলে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে তাকালেন রাশেদের দিকে। রাশেদ চেচাচ্ছে কেন? পরমুহূর্তেই আরমান যা দেখলেন তাতে তিনি বাকশূন্য হয়ে পড়লেন। লোকটি যে তাকে টানছে সেটা অনুধাবনের ক্ষমতাও যেন তিনি হারিয়ে ফেললেন।

এ তিনি কি দেখছেন? নায়লার জামার সামনের অংশে রাশেদ প্রথমে খানিকটা সোডা ঢাললো, তারপর ওয়েটারের দিয়ে যাওয়া লবণদানি থেকে অনেকটুকু লবণ ঢাললো। তারপর শাদা একটি হ্যান্ডকারচিফ দিয়ে সেখানে ঘষতে লাগলো। আরমানের যেন হার্ট অ্যাটাক হবার উপক্রম। কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, এই রাশেদ, কি করছো তুমি?

রাশেদ যথানিয়মে নায়লার বুকের সেনসিটিভ অংশের ওপর হ্যান্ডকারচিফ দিয়ে ঘষতে লাগলো আর বললো, আরমানভাই, ওই যে আপনি ওই দিন হাফ গ্লাস সোডা আর সল্ট দিয়ে চায়ের দাগ দূর করার যে টেকনিকটা শিখিয়েছিলেন ওটা অ্যাপ্লাই করছি। দেখছেন না আপনার হাত থেকে চা ছিটকে ভাবীর জামাতে সব এসে পড়েছে। আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনি বরং ওই লোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন। ভাবীর জামা থেকে চায়ের দাগ ক্লিন করার সব দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিন।

আরমান ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

অস্টিন, টেক্সাস থেকে

htouhid@yahoo.com

শীত নিবারণী

- নুসরাত নওশীন শ্রাবণী

ডিসেম্বরের শেষ অথবা জানুয়ারির প্রথম আজ আর সঠিক মনে নেই। মনে নেই মধ্য ভারতের সেই জাংশন স্টেশনটার নামও। ট্রেন সেখানে মিনিট পনেরো দাড়াবে শুনে প্ল্যাটফর্মে নেমে সামনেই একটা চা কাম বুক স্টলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

প্রচণ্ড শীতের ভোরে এক কাপ চায়ের উষ্ণতার সঙ্গে বুক স্টলের বই নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ লক্ষ্য করি আমার পাশেই এক জীর্ণ–শীর্ণ রমণী নোংরা–শতচ্ছিন্ন কামিজ পরনে দোকানিকে এক মগ চা দিতে বলছে। কোলে হাড়জিরজিরে মাথা ন্যাড়া এক দেড় বছরের শিশু।

দোকানি সন্দেহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো, পৈসা কাহা?

রমণীটি একটি এক টাকার কয়েন বের করে রাখলো সামনে।

দোকানি তাকে এক মগ চা এগিয়ে দিলে রমণীটি শিশুটির হাতে ধরা এলুমিনিয়ামের বাটিটি টেনে নিয়ে তাতে চা ঢেলে দিতে বললো।

দোকানি সেই দোমড়ানো এলুমিনিয়ামের বাটিতে চা ঢেলে দিল।

এক কোলে শিশু, আরেক হাতে চায়ের বাটি নিয়ে রমণীটি কাছেই একটা থামের নিচে বসলো।

তখন চোখে পড়লো, তাদের পাশেই একটা বোচকা আর তার উপরে রাখা একটা তালি মারা চাদর।

এই হাড় কাপানো শীতে একটি সামান্য চাদর ছাড়া মা এবং শিশু কারো গায়ে কোনো গরম পোশাক না দেখে আমি স্তম্ভিত। অপলক তাকিয়ে আছি তাদের দিকে। দেখি মা ধোয়া ওঠা গরম বাটিতে ঠোট ছোয়াচ্ছে। শিশুটি সেই গরম বাটির দিকে বার বার তার দুর্বল ছোট্ট দুটি হাত বাড়াচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে চারদিকে ঘন কুয়াশার আস্তরণ। মাথায় মাংকি ক্যাপ, মাফলার আর শরীরে কয়েক কেজি ওজনের গরম পোশাক জড়িয়ে নানান ধরনের যাত্রীরা সব ট্রেনে উঠছে, নামছে।

শীতের এই তীব্রতা যেন ওই থামের নিচে এসে থমকে গেছে।

মা-টি এক সময় ফু দিয়ে দিয়ে বাটির অবশিষ্ট চা শিশুটিকে পান করালো।

আমার অসকার ওয়াইল্ড-এর সেলফিশ জায়ান্ট-এর গল্পটা মনে পড়লো। রাক্ষসের বাগানসহ শহরের সকল বাগানে শীত দাপাদাপি করছে, শুধু রাক্ষসের বাগানের উত্তরতম কোণে তখনো বসন্ত বিরাজিত। আমাদের দেশে এক দেড় বছরের শিশুকে আমরা কখনো চা পান করাই না।

যতো গরিবই হোক, শীত নিরাবণে যাহোক কাপড়-চোপড় কিছু জোটে। কিন্তু শুধু এক মগ চা এমন করে মোষের শিং নাড়ানো শীতে কাউকে উষ্ণতা দিতে পারে এ অভিজ্ঞতা আমার প্রথম।

আমি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি শিশুটির ছোট্ট দুটি হাতে ঠোটের কাছে উচু করে ধরা দোমড়ানো এলুমিনিয়ামের বাটিটির দিকে আর ভাবছি শীত নিবারণী সামান্য চায়ের অসীম ক্ষমতার কথা।

ঘোর কাটলো দোকানির কথায়, *উও কিতাব আব খরিদেংগে কেয়া?* ওই বইটা কি আপনি কিনবেন?

চা ও হাতে ধরা বইটার দাম দিয়ে নিজের নির্ধারিত বগিতে ফিরে এলাম।

খুলনা থেকে

সমঝদার সঙ্গী

– মণিকা

চায়ের সঙ্গে আমার বাবার সম্পর্ক অতি নিবিড়। চা তার অত্যন্ত প্রিয় পানীয়। চায়ের ফ্লেভার ভালো না হলে কিংবা লিকার, চিনি, দুধ-এর সমন্বয় সঠিক না হলে সে চা তিনি ছোবেনই না। এমন সমঝদার চা-প্রিয় তিনি। বাবার পাশাপাশি আমিও তাই।

আমাকে দেড় বছর বয়স থেকে পিরিচে করে চা খাওয়াতেন তিনি।

মা কতো রাগ করতেন।

তিনি শুনতেন না।

এই করে করে চায়ের প্রতি আমি এমনই আসক্ত হয়ে গেলাম যে, চার বছর বয়স থেকে আমি পরিবারের সকাল-বিকেল দুই বেলার চায়ের আসরের নিয়মিত সদস্য।

খুব চায়ের কাপ ভাঙতাম বলে আমাকে শিশু বয়সে টিনের তৈরি চায়ের কাপ দেয়া হতো।

বাবা ছিলেন সরকারি প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ-এর ইতিহাসের প্রফেসর। কলেজ তখন বেসরকারি ছিল। কলেজের পাশেই ছিল মোজাম্মেল-এর চায়ের দোকান। ওখানেই কলেজের প্রফেসরদের নিয়মিত চায়ের পেয়ালাসহ আড্ডা বসতো।

বাবার সঙ্গে আমিও নিতান্ত শিশু বয়স থেকে ওই আড্ডার প্রায় নিয়মিত সদস্য ছিলাম। মোজাম্মেল আমার জন্য তার ভাষায় *ইস্পেশাল* চা অর্থাৎ বেশি দুধ, চিনি আর কম লিকারের চা নির্দিষ্ট একটা কাচের ছোট গ্লাসে দিতেন।

গরম বলে ধরতে পারবো না, সে জন্য ঠাণ্ডা করে দিতেন।

আমি বাবার সঙ্গে ওই চা আর শক্ত কেক, বিস্কিটের নিয়মিত ক্রেতা ছিলাম।

কলেজ যখন সরকারি হলো তখন কলেজেরই একজন বেয়ারা, সুলতান ছিল তার নাম, সে নতুন আঙ্গিকে ঝকঝকে কাপ–পিরিচ আর আসবাবপত্রসহ নতুন একটা চায়ের দোকান দিল ওই মোজাম্মেলের চায়ের দোকানের পাশে।

নতুন দোকানে স্বাভাবিকভাবে ভিড় জমলো বেশি। গ্লাসের পরিবর্তে চায়ের কাপে পরিবেশিত চা সবাইকে আকৃষ্ট করলো। আর মোজাম্মেলের দোকানের বদলে সুলতানের দোকানে জমতে লাগলো ভিড়। সেই সঙ্গে মোজাম্মেল দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে লাগলো অর্থনীতির নিয়মানুসারে।

তখন সেই শিশু বয়সে এতো কিছু বুঝতাম না, শুধু দেখতাম ক্রেতাবিহীন মোজাম্মেল চুপচাপ বসে আছে গালে হাত দিয়ে, আর কলেজের প্রফেসর ও ছাত্র সবাই ভিড় করছে সুলতানের চায়ের দোকানে।

তখন একটু বড় হয়েছি, স্কুলে যাওয়া শুরু করেছি। বাবার সঙ্গে আর চায়ের দোকানে যাই না। কিন্তু তখনো মাঝে মধ্যে অন্য কোনো দোকানে যাওয়ার পথে মোজাম্মেলের চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে ডাকতেন – *ও সোনা, আসো, তোমারে ইস্পেশাল চা খাওয়াবো।*

হেসে চলে আসতাম।

এখন বুঝি কতোটা ভালোবাসা আর আদর দিয়ে তিনি আমাকে ডাকতেন।

আমার বাবা অত্যন্ত ভালো দাবা খেলতেন। এমন কি তিনি ড. কাজী মোতাহার হোসেন–এর মতো দাবাড়ুর সঙ্গে খেলে একবার তাকে হারিয়েছিলেন। যদি বাগেরহাট–এর মতো মফস্বল শহরে না থাকতেন তা হলে তিনি খুব নামকরা একজন দাবাড়ু হিসেবে পরিচিতি পেতেন, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। দাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল চায়ের। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাবা খেলছেন আর সেই সঙ্গে চলতো কিছুক্ষণ পর পর চা। সঙ্গে তেমন কিছু দরকার হতো না, একটু মুড়িমাখা কিংবা টোস্ট বিস্কিট হলেই চলতো। কিন্তু চা দিতে হবেই একটু পর পর বাবা আর তার অপর খেলার সঙ্গীকে।

মা খুব বিরক্ত হতেন মাঝে মধ্যে। কাজের লোকরা এতো বার বার চা বানাতে চাইতো না। তখন রান্নাঘরে যেতাম আমি। আর যতোবার বাবা চা চাইতেন ততোবারই চা বানাতাম তিন কাপ করে। এক কাপ আমার।

মফস্বল শহরে খুব ভালো চা পাতা পাওয়া যেতো না। বাবা যে কতো খুজে খুজে ভালো চা পাতা আনতেন শুধু ভালো ফ্লেভারের জন্য। বাবার কারণেই আমি এখন চায়ের ভালো–মন্দ বুঝি, ফ্লেভার আর লিকার দেখে।

প্রথমবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর দুধ, চিনিসহ চা খাওয়া ডাক্তার বন্ধ করে দিলেন। এই নিয়ে আমার বাবার কতো রাগ!

আব্বাকে বললাম, আব্বা আমার অফিসে আমরা লিকার খাই। এতে ফ্লেভার আরো ভালোভাবে পাওয়া যায়।

আব্বা কিছু বলতেন না। কিন্তু বুঝতাম এ কথা শুনে তিনি আরো বিরক্ত হতেন। তার ভালো ফ্লেভারের সঙ্গে দুধ আর চিনিও দরকার ছিল নিজস্ব তৃপ্তির জন্য।

আজ যখন এই লেখা লিখছি, আমার বাবা আর নেই। মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে গত ১৩ মে ২০০৫–এ তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন দ্বিতীয়বারের অ্যাটাক–এ, যেটা ম্যাসিভ ছিল। আজ চারদিকে খুজি বাবার সেই মুখ, সেই চা পান করার বিশেষ ভঙ্গিমা, তৃপ্তির সঙ্গে চুমুক দিয়ে একটা বিশেষ তৃপ্তির শব্দ করা। কোথাও নেই, কিছু নেই। এ যে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা, যারা বাবা হারিয়েছেন, শুধু তারাই বুঝবেন।

আমার বাবা আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিলেন। কোনো একটা সুখবর সবার আগে, এমনকি আমার স্বামীরও আগে বাবাকে বলতে যেতাম। আমার কথা শোনার কেউ নেই এখন। নেই আমার আশৈশব চা খাওয়ার সেই সমঝদার সঙ্গী।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

prava16@hotmail.com

ওষুধ

- মুনির

ওনার নাম আবদুল কুদ্দুস ঢালী। সম্পর্কে আমার চাচা। গ্রামীণ মাতব্বর শ্রেণীর লোক। জমি-জিরাত আছে পর্যাপ্ত। কিন্তু মোড়লিপনায় ঝোক বেশি থাকায় সারা বছর সংসার চলে টানাটানিতে।

গায়ের লোক হলে কি হবে, তার আছে চা পানের মতো এক অভিজাত অভ্যাস। তবে এর জন্য তিনি বাড়ির কাউকে কষ্ট দিতে রাজি নন। যেহেতু বাড়িতে চা হবে না, তাই পায়ে হেটে দুই মাইল দূর থানা শহর হোসেনপুরে চলে আসেন চা পানের জন্য। কোনো কোনোদিন দুইবারও আসা-যাওয়া পড়ে।

এ চা পান নিয়েই আছে এক মজার কাণ্ড।

গ্যাস্ট্রিকে আক্রান্ত ঢালী সাহেব নিজের ডাক্তারি নিজেই করে থাকেন। কিন্তু একবার তার ডাক্তারি বিদ্যা ফেল মারায় বাধ্য হয়েই হাসপাতালে শয্যাশায়ী হলেন।

চাচাকে প্রতিদিনই হাসপাতালে দেখতে যেতাম, আর তখনই তিনি ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় আবদার করতেন, *বাবা, এক কাপ চা খাইলে মনে হয় আমি বালা অইয়্যা যায়াম*।

ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি বললেন, রোগীর গ্যাস্ট্রিকের যে অবস্থা এই মুহূর্তে চা পান না করাই উত্তম।

যাই হোক। চা-তৃষ্ণায় কাটতে লাগলো তার দিন। বহু চেষ্টায়ও কোনো নার্সকে ম্যানেজ করেও পেলেন না এক কাপ চা।

অবশেষে চান্সের আশায় প্রহর গুনতে লাগলেন। থানা শহরে প্রায়ই বিদ্যুৎ লোডশেডিং হয় আর তিনিও এমনি একটি লোডশেডিংয়ের অপেক্ষায় ছিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় আমি কয়েকজন বন্ধুসহ একটি চা স্টলে চা পান করছি। বাইরে ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি হচ্ছে। আর তখনি বিদ্যুৎ চলে গেল। পুরো শহর অন্ধকারে ঢেকে গেল।

মিনিট তিনেক বাদে আমার সেই চাচাকে দেখলাম বৃষ্টিতে ভিজে চায়ের স্টলে ঢুকছেন। প্রথমে তিনি আমাকে খেয়াল করেননি। স্টলে ঢুকেই ওয়েটারকে অর্ডার দিলেন, *এই বেডা, ডাবল চা দে, আগলা পাতি মাইর‍্যা*।

আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে বললাম, কাকা, আপনি হাসপাতাল থেকে এলেন কি করে?

তিনি বললেন, বাবা, তিনটা দিন ধরে এই চান্সের আশায় বসেছিলাম, কোন সময় কারেন্ট যাবে আর আমি পালিয়ে আসবো।

বললাম, আসলেন তো, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ডাক্তার যে মানা করলো চা পানের জন্য।

তিনি বললেন, দুর বাদ দাও তোমার ডাক্তারের কথা, এই চা-ই হলো আমার রোগের ওষুধ।

বসে বসে দেখলাম দুই কাপ চা একের পর এক পরম তৃপ্তির সঙ্গে পান করে অনেকটা ফ্রেশ বোধ করলেন। শেষে এই চাপ্রীতির জন্যই লোটা-কম্বল হাসপাতালে রেখেই হাটা দিলেন বাড়ির পথে।

রিয়াদ থেকে

monirsofa2@hotmail.com

সুস্বাস্থ্যের জন্য

– আতিকুর রহমান রিপন

আপনি কি জানেন -

এক. এক কাপ কফির তুলনায় এক কাপ চায়ে অর্ধেকেরও কম পরিমাণ ক্যাফিন থাকে। এক কাপ চায়ে ক্যাফিন থাকে পঞ্চাশ মিলিগ্রাম।

দুই. দুধ ছাড়া চায়ে কোনো ক্যালরি থাকে না। স্বল্প চর্বিযুক্ত দুধ ব্যবহার করলে প্রতি কাপে ক্যালরির পরিমাণ তেরো। তবে মিনারাল ও ক্যালসিয়ামের মূল্যবান উপকার পেতে পারেন।

তিন. দুধ মিশ্রিত চার কাপ চায়ে আপনি প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের শতকরা পনেরো ভাগ চাহিদা মেটাতে পারেন।

চার. গরমের সময়ে চা আপনার শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে ঘাম তৈরি করে, যা আপনার চামড়া ঠাণ্ডা রাখে।

এক কাপ নিখুত চা

এক. সব সময় তাজা পানি ব্যবহার করুন। পানি বার বার ফোটালে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় যা থেকে অনেক সময় ধাতব স্বাদ পাওয়া যায়।

দুই. দুধ চা পান করার আগে চায়ের কাপে আগে দুধ ঢেলে নিন, তারপর চা ঢালুন যাতে দুধের চর্বিটা গরম ধোয়ার সঙ্গে উড়ে যায়।

তিন. যদি চায়ের ব্যাগ ব্যবহার করেন তবে দুধ পরে ঢালুন।

চার. নিজের পছন্দ মতো তিন থেকে চার মিনিট ব্যাগটি ডুবিয়ে রাখুন।

পাচ. চায়ের ব্যাগ অথবা পাতা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য সমান লাভজনক।

ছয়. সবুজ অথবা কালো চা দুটোতেই স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ কার্যকারিতা।

কিছু তথ্য

বেশিরভাগ মানুষ প্রতিদিন চা খেতে পছন্দ করে। গত কয়েক বছরের গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতিদিন চা সেবন স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

প্রতিদিন চা সেবনে যে পরিমাণ প্রয়োজনীয় তরল পদার্থ আমাদের শরীরে যোগান দেয় তা থেকে হৃদরোগ ও কয়েক ধরনের ক্যানসার থেকে অনেকটা মুক্ত থাকা যায়।

ক্যাফিন নিয়ে দুর্ভাবনার অবকাশ নেই। প্রতিদিনের চায়ের মাধ্যমে যতোখানি ক্যাফিন আমরা সেবন করি তা আমাদের কোনো ক্ষতি করে না, বরং লাভজনক হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত চা সেবনে রক্তকণিকায় অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ে। বার্ধক্যে স্মরণশক্তি ধরে রাখার ব্যাপারে চা আমাদের সহায়তা করে।

শরীরে পানির যোগান

এক. সাধারণত চা সেবনে পানি শূন্যতা রোগের কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে যদি এক বসায় পাচ থেকে ছয় কাপ চা পান না করলে আড়াইশ থেকে তিনশ মিলিগ্রাম ক্যাফিন শরীরে থাকবে। তা থেকে পানি শূন্যতা (ডায়ারিয়া) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দুই. বৃটিশ ডায়েটিক সোসাইটির তথ্য মতে, শরীরে পর্যাপ্ত পানি যোগান নিশ্চিত করতে দেড় থেকে দুই লিটার চা সেবন করা যেতে পারে।

ক্যাফিন তথ্য

এক. প্রতিদিন চার কাপ চা স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকারী ও অন্যান্য ক্যাফিনযুক্ত পানীয় থেকে উত্তম।

দুই. চার কাপ চায়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যাফিন থাকে যা আমাদের চিন্তাশীলতা ও কার্যক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক।

তিন. এক কাপ কফি অথবা কফি শপ থেকে কেনা কফির তুলনায় অনেক কম পরিমাণ ক্যাফিন থাকে চায়ে।

দাতের স্বাস্থ্যে চা

এক. চা আমাদের দাতের জন্য ক্লোরাইডের যোগান দেয় এবং প্রতি তিন থেকে চার কাপ চায়ে শতকরা পয়তাল্লিশ ভাগ ক্লোরাইড পাওয়া যায়।

দুই. প্রতিদিন চা সেবনে যে পরিমাণ ক্লোরাইড আমরা গ্রহণ করি তা থেকে বিভন্ন প্রকার দন্তরোগ ও মাড়ির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

তিন. মুখের ভেতর শুষ্ক থাকলে দাতের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা দেখা দেয়। নিয়মিত চা সেবন আমাদের মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

শেষ কথা

অন্তঃসত্বা মহিলাদের প্রতিদিনের ক্যাফিনের পরিমাণ তিনশ মিলিগ্রামের মধ্যে কমিয়ে আনা উচিত যা প্রতিদিন ছয় কাপ চায়ের সমপরিমাণ।

কুয়েত থেকে

atiqurrahman@coolgoose.com

হারাম

- মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া

১৯৮৮ সাল। ভয়াবহ বন্যায় বলতে গেলে সমস্ত দেশটাই পানিতে ডুবে গেছে। এর মধ্যে নিচু এলাকা বলে বিখ্যাত ঢাকা শহরের গোড়ান এলাকা আগেই ডুবে গেছে। বাসার কাজের মেয়ে রাশিদা প্রায়ই বিকেলের দিকে এসে আমাদের গ্যাসের চুলায় রান্না করে নিয়ে যেতো। এক বিকেলে ঘুম থেকে উঠে দেখি আম্মা বাসায় নেই। ভাবলাম কোথাও গেছে হয়তো। মুখ ধুয়ে এসে ভাবলাম চা খেতে হবে।

এসে দেখি চুলায় ভাতের হাড়ি বসানো। তখন আমাদের বাসায় এক বার্নারের চুলা। ভাত নামিয়ে চুলায় চায়ের পানি বসিয়েছি। চা তৈরি শেষে আবার চুলায় ভাতের হাড়ি বসিয়ে বারান্দায় এসে বসেছি। দুই এক চুমুক চা খেয়েছি মাত্র। এমন সময় আম্মা ঘরে ফিরে এলেন। দেখলেন, আমার হাতে চায়ের কাপ।

ভেতরের রুমে যেতেই কাজের মেয়ে আম্মার কাছে নালিশ করেছে, ভাতের হাড়ি নামিয়ে চা বানানোর কারণে তার ভাত নষ্ট হয়ে গেছে। পরের ক্ষতি দেখে আমার মা বারান্দায় এসে জোর গলায় বলছেন, চাওয়ালার ঘরের চাওয়ালা, সকাল-বিকেল চা না হলে চলে না! একদিন চা না খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। চা বানাতে গিয়ে ভাত নষ্ট করলি? এখন তুই ভাত রাইন্ধা দিবি।

আম্মার কথা শুনে আমি থ হয়ে গেলাম। সামান্য চায়ের কারণে মা হয়ে ছেলেকে এভাবে বলতে পারলেন!

আম্মাকে বললাম, আমি যখন চায়ের পানি চুলায় দিচ্ছিলাম তখন রাশিদা পাশে দাড়িয়ে বোবার মতো কি দেখছিল? আমাকে বললেই পারতো, ভাই, এখন চুলা থেকে ভাত নামিয়ে রাখলে ভাত নষ্ট হয়ে যাবে। ভাত রান্নার পর আমি আপনাকে চা বানিয়ে দেবো।

খালাম্মা ঘরে আসামাত্রই নালিশ করেছে। কাজের মানুষের কাছে নিজের ছেলে যখন এতোই তুচ্ছ তখন আমিও আর চা খাবো না। আজ এই মুহূর্ত থেকে আমার জন্য চা খাওয়াকে হারাম করলাম। আল্লাহর কসম করে বলছি, এই জীবনে আর কখনো চা খাবো না।

কথাগুলো বলে বাকি চাটুকু বারান্দা দিয়ে বন্যার পানিতে ফেলে দিলাম। রাগী আমি একবার যে কথা মুখ থেকে বলে ফেলি তা কখনো পরিবর্তন করি না।

কঠোর মনোবলের কারণে গোপনে কোথাও চা খাইনি কিংবা চায়ের খুব তৃষ্ণা পাচ্ছে, এক কাপ চা খেতেই হবে এমন কখনো হয়নি।

অনেকেই বলে, চা খেলে গায়ের রঙ কালো হয়ে যাবে বলে কি চা খান না?

আজ ১৭ বছর যাবৎ এই প্রতিজ্ঞা বহাল আছে।

সবচেয়ে দুঃখের ও অবাক হওয়ার বিষয়, আমার মা কখনো বলেননি, যা হবার হয়েছে আবার চা খাওয়া শুরু কর।

দক্ষিণ গোড়ান, খিলগাও ঢাকা থেকে

কাপ ভাঙার কারণ

- সুলতান মাহমুদ

প্রথম আছাড়ে ভাঙলো চায়ের কাপ, দ্বিতীয় আছাড়ের শিকার হলো পিরিচটা। রাগে, উত্তেজনায় থর থর করে কাপছে, সিংহির মতো গর্জন করে আমাকে শোনাচ্ছে, চা খাওয়ার গুষ্ঠি মারি, সুন্দরী মহিলা দেখলে হুশ থাকে না, অতো ভুবন ভোলানো হাসি, ফুচুর ফুচুর গপ্পো কই থেকে আসে! আমার কাছে বসলে তো দেবদাসের মতো উদাস হয়ে থাকো।

আরো কিছু অশালীন, অশ্রাব্য ভাষা সে আমার কানের ওপর জোরজবরদস্তি করে ঢাললো।

অনর্গল বর্ষণে রীতিমতো হাত পা নাড়ন-চাড়নে এক সময় মহিলাটি ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ধপাস করে বসে পড়ে হাপানি রোগিনীর মতো শ্বাস নিতে লাগলো।

ঘুর্ণিঝড় কমে আসার আভাস পাচ্ছি।

বদমেজাজি মহিলা যিনি ভাঙা-ভাঙিতে অত্যন্ত দক্ষ তিনি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী যার সঙ্গে সুদীর্ঘ বারোটি বছর অতিক্রম করেছি। তার এ রকম আচরণে মোটেই হতবাক হইনি। এ রকম ঘটনা যে ঘটবে তা আগে থেকেই অনুমান করছিলাম। এবার ঘটনা ঘটার কারণটা বর্ণনা করি।

বিকেলবেলাকে অলস ভঙ্গিতে বসে আছি। সে সময় আমার স্ত্রীর সুন্দরী এক বান্ধবী এলো। স্বভাবসুলভ হাসিতে তাকে স্বাগত জানালাম।

সহজ সরলা এই মহিলার সঙ্গে আমার গল্পে-সল্পে বেশ জমে। খোশগল্পে মেতে উঠি। মাঝে মধ্যে মজার মজার কিছু জোক বলছি, খিলখিল করে হেসে উঠছেন তিনি। অত্যন্ত নির্মল ও স্বচ্ছ সে হাসি, তাতে কোনো ভেজাল দেখছি না। আমার গায়ে পড়ে রসালো গল্প করা এবং তার খিলখিল করে হেসে ওঠাতে একজন জ্বলেপুড়ে মরছে তা বুঝতে পারছি। সে আমার স্ত্রী, আমার একমাত্র ছেলে অনিকের মা। কিচেনে চা বানাচ্ছে আর রাগে রাগে ফুলছে। বান্ধবী তার, গল্পে মেতে উঠবে সে, অথচ সেই স্থান দখল করেছি আমি। কাজেই জ্বলেপুড়ে খাক হওয়ার কথাই তার।

আমার ম্যাডাম মাঝে মধ্যে কিচেন থেকে আমাদের মাঝে আসছে, মেকি হাসি হাসছে, টুকটাক কিছু বলছে আবার চলে যাচ্ছে। তার ফুলেফেপে ওঠা গোপন রাগটি এক সময় যে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

তিনজনে চা–চানাচুর খাচ্ছি, গল্প চলছে।

কিন্তু অনিকের মায়ের গল্পে তেমন মনোযোগ নেই। বুঝতে পাচ্ছি, অনিকের মা মনে মনে চাচ্ছে এই বজ্জাত মহিলা অতি দ্রুত এখান থেকে বিদায় নিক। তার এই উসখুস স্বভাবে মনে মনে বেশ মজা অনুভব করছি। ধীর গতিতে চা খাচ্ছি, আকাবাকা হাসছি। যেচে যেচে গল্পে মাতছি। ম্যাডাম আমার চেতে উঠুক, রাগে ফুলে ফুলে ঢোল হয়ে যাক।

এক সময় গল্প শেষ হলো।

বান্ধবীটি বিদায় নিল।

তারপর যা ঘটলো তা আগেই বলেছি।

অবশেষে শর্ত সাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করলাম। তার কোনো বান্ধবীর সঙ্গে দাত কেলিয়ে হাসবো না, কাছাকাছি বসে চা পান করবো না, রসের গল্প সল্প করবো না। শান্তি চুক্তিতে সেদিনের মতো সন্ধি হলো।

কয়েকদিন পর।

সেই রকম বিকেলবেলায় সেই অপরূপা রসবতী এলো। কপাল দোষে, না গুণে জানি না। সেদিন সেভাবেই বাসায় ছিলাম। তবে এবার তাকে দেখেই সাবধান হয়ে গেলাম।

সালাম দিল আমায়।

জবাব দিলাম কর্কশ ভাষায়। ইচ্ছা করেই দূরে সরে বসলাম, গম্ভীর একটা মুডে এমনভাবে তার সঙ্গে আচরণ শুরু করলাম যেন সে বুঝতে পারে যে, সে আসাতে আমি মোটেই খুশি নই।

মহিলা আমার এমন আচরণে কিছুটা থতমত খেলো, কিছুটা হেসে–কেশে নর্মাল হবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু আমি তাতে সায় দিলাম না।

আমার স্ত্রী সবই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। বুঝতে পারছি যে ভীষণ রেগে যাচ্ছে, ভাবছে আমি সেদিনের প্রতিশোধ নিচ্ছি।

আমি খুশি প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেয়ে।

ম্যাডাম আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে হাসিখুশিতে কথা বলে তার বান্ধবীকে খুশি রাখতে। বার বার আমাকে বলছে, ওগো, ওর (বান্ধবী) সঙ্গে গল্প করো, আমি চা বানিয়ে আনছি।

কিন্তু আমি আমার অবস্থানে অনড়। সুযোগটা আজকে আমি পাই পাই করে কাজে লাগাবো। একটা শিক্ষা তাকে দিতে হবে।

ভদ্রমহিলা ভীষণ অপমান বোধ করতে লাগলেন। অবশেষে আমাকে বলেই ফেললেন, ভাইসাব, আমি আসাতে আপনারা কি বিরক্ত?

এবার কিছুটা হাসলাম। কাষ্ঠ হাসি।

না না, আমার শরীরটাই আজ সকাল থেকে খুব খারাপ যাচ্ছে। কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

বুঝতে পারলাম আমার উত্তরে তিনি মোটেই খুশি হলেন না। ঠিক সে রকম কাষ্ঠ হাসি হেসেই তিনি বললেন, ও আচ্ছা।

ইতিমধ্যে অনিকের মা চা–নাশতা নিয়ে হাজির হয়েছে। পরিশ্রমে ঘেমে একাকার হয়ে গেছে। তারপরও তার মুখে প্রাণখোলা অমায়িক হাসি। বান্ধবীকে বললো, নে, চা–বিস্কিট খা, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিন্তু আমাদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে রসবতী উঠে দাড়ালেন। না রে, ওসব কিছু খাবো না। আমার কাজ আছে, চলি।

ভীষণ বিরক্তিকর একটা ভাব নিয়ে হন হন করে তিনি চলে গেলেন।

শুরু হলো আমাদের দ্বিতীয় দিনের কাপ ভাঙা পর্ব। গিন্নি আমার রেগেমেগে অস্থির। তুমি ইচ্ছা করেই আমাকে, আমার বান্ধবীকে চরম অপমান করছো।

ট্রে মেঝেতে ধপাস করে ফেলে দিল। দুটো কাপ ভাঙল। একটা অক্ষত রইলো।

আমার পাচ বছরের ছেলে অনিক অক্ষত কাপটি হাতে নিয়ে বললো, আম্মু, এটা আমি ভাঙি?

জবাবে তার মা ঠাস করে তার গালে একটি কষলো। ব্যথাটা বড় লাগলো আমার।

কি যে করি!

বকুলতলা, জামালপুর থেকে

অনুমোদিত

- মশিউর রহমান যাদু

যেহেতু ছাত্র রাজনীতি করি সেহেতু আমার কাছে চায়ের দাম অনেক অনেক বেশি। কারণ মিছিল-মিটিং শেষে গরম এক কাপ লাল চা না খেলেই মনে হয় ছাত্র রাজনীতির কোনোখানে অপূর্ণতা রয়ে গেছে। অথচ কিছুদিন আগেও আমি চা খেতাম না।

আমার কলেজের একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কলেজের পরিবেশ উন্নয়ন মিটিংয়ের শেষে নাশতা খাওয়ার পরে আমাকে চা খেতে বলেছিলেন।

বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার, আমি চা খাই না।

তখনই স্যার আমাকে বললেন, যাদু, তুমি ছাত্র রাজনীতি করো, অথচ চা খাও না, এটা মেনে নেয়া যায় না।

বললাম, কেন স্যার?

এর কারণটা হচ্ছে, যখন তুমি বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাবে তখন অন্য ছাত্রনেতাদের সঙ্গে তোমাকে চা দেবে। যদি তুমি চা না খাও তাহলে সামাজিকতা রক্ষা করা হবে না। তাই তোমার চা খাওয়া শেখা উচিত। কারণ প্রতিনিধিদের কাছে তোমার গ্রহণযোগ্যতা আর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে তোমার অবস্থান ধরে রাখতে চা-এর বিকল্প কিছুই নেই।

কিন্তু ছাত্র রাজনীতি করি বলে যে আমার মন নেই, মনের মানুষ নেই, এটা ঠিক না। আমার মন ও মনের মানুষ দুটোই আছে। সেদিন স্যারকে বলতে পারিনি, স্যার, আমি যাকে ভালোবাসি, যাকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করি সে চা খাওয়াটা পছন্দ করে না, আমি কিভাবে খাই?

তবে সেদিন স্যারের কথা রাখার জন্য পরিবেশ উন্নয়নের মিটিং শেষ করে সোজা চলে যাই আমার ভালোবাসার মানুষটার কাছে।

তাকে স্যারের সব কথা বলার পর সে আমাকে বললো, স্যার তোমার গুরুজন, তার কথা তোমার রাখা উচিত।

স্যারের সূত্রে সে আমাকে মিছিল-মিটিং শেষে এক কাপ লাল চা খাওয়ার অনুমতি দিল।

তারপর থেকে মিছিল, মিটিং শেষে যখন ক্লান্ত হয়ে যাই তখন এক কাপ লাল চা হাতে ভালোবাসার মানুষটার কথা ভাবতে ভাবতে চায়ের কাপে মুখ দিতে বেশ ভালোই লাগে।

খুলনা থেকে

ইভা

- সুজন

আমার অফিসের পাশের বিল্ডিং–এর নিচের তলায় একটি বেসরকারি ব্যাংক। ওখানে আমার একটি একাউন্ট আছে। টাকা ওঠানো ও জমা দিতে প্রায়ই যেতে হয়। বছর খানেক আগে এক দিন দেখি ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টার আলো করে, গভীর কালো চোখের, শান্ত চেহারার একটি মেয়ে বসে আছে। বুঝলাম নতুন জয়েন করেছে। ব্যাংকে যেতে– আসতে ক্লায়েন্ট হিসেবে তার সঙ্গে দুই একটি কথা হয়েছে। দেখেছি কোনাকুনি তাকায়, কম কথা বলে, শান্তভাবে নিজের কাজ করে।

চোখ দেখে সহসা মনের ভাব বোঝা যায় না। মুখমণ্ডল গম্ভীর কিন্তু সরলতায় ভরা।

ওনাকে দেখার বেশ কয়েকদিন পর একদিন সকালে আমার এক মামার চোখ দেখানোর জন্য ফার্মগেট ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে গিয়েছিলাম। মামার চোখ দেখে ডাক্তার দুইটি টেস্ট দিলেন। দোতলায় ডাক্তারের রুমে রোগীদের বসার জায়গায় মামাকে বসিয়ে রেখে নিচ তলায় যাচ্ছি টাকা জমা দিতে। মাথা নিচু করে দ্রুত হাটছি বারান্দা দিয়ে।

সামনে থেকে মেয়ে কণ্ঠের প্রশ্ন এলো, এই যে দাড়ান। ভালো আছেন?

চোখ তুলে দেখলাম ব্যাংকের সেই নীরব, কোমল সুন্দর মেয়েটি।

বললাম, আপনি! আমায় মনে রেখেছেন?

তিনি শান্ত এবং আরো শান্ত কণ্ঠে বললেন, নিশ্চয়ই। আমার দুটি চোখ এবং একটি মন আছে।

বললাম, নিশ্চয়ই সেগুলোর অপব্যবহার করেন না।

তাহলে বলেন, এখানে কেন?

সংক্ষেপে এবং দ্রুত আমার এখানে আসার কারণ বলে তার আসার কারণ জানতে চাইলাম। তিনি যা বললেন তা এ রকম – আমার মামাকে যে ডাক্তার দেখেছেন, ওনার মাকেও সেই ডাক্তার দেখেছেন। ওনার মায়ের চোখের চারটি টেস্ট দিয়েছেন যার মোট মূল্য তিন হাজার পাচশ পঞ্চাশ টাকা। এতোগুলো টাকা তিনি সঙ্গে করে আনেননি। কারণ এতো টাকার টেস্ট লাগবে তিনি বুঝতে পারেননি। ওনার কাছে যা আছে তা বাদে আরো এক হাজার দুইশ টাকা লাগবে। আজকে টেস্টগুলো করাবেন না ভেবে মাকে ডাক্তারের রুম থেকে আনতে যাচ্ছেন চলে যাবেন বলে।

খুব স্বভাবিকভাবে কথা বললেন। তবে হাসেন কম। তখনো ওনার মানসিকতা, ব্যক্তিগত ব্যাপার, সৌন্দর্য বা তারও বেশি কিছু এসব আমার চিন্তায় ছিল না। তবে ওনার নিজের ভেতর কোথায় যেন গভীর ব্যক্তিত্বের প্রলেপ রয়েছে। দুজনেই চুপ আছি দেখে আমার নাম বলে বললাম, আমি আপনাকে হেল্প করি?

তিনি নিশ্চলভাবে বললেন, আমি ইভা, আপনি টাকা দিয়ে হেল্প করতে চান, তাই তো?

মিষ্টি মেয়ের কথা তো মিষ্টি হবেই। বাতাসে মিশে যাওয়ার আগে তার কণ্ঠস্বর কানের গভীরে পরিষ্কার স্পর্শ করে যায়। বললাম, একদম তাই, আপনি সম্মত থাকলে।

আমার খুব দ্বিধা লাগছিল। কিন্তু এটা মনে হচ্ছিল, হঠাৎ খারাপ কিছু মনে করার মতো মেয়ে উনি হতে পারেন না, এ বয়সেই চেহারায় খুব দৃঢ়তা!

বললাম, আপনার পুরো নাম কি?

এতোদিনে এবং এতোক্ষণে উনি আমার দিকে সম্পূর্ণ তাকালেন। মুখ দিয়ে বললেন, নুশরাত ইয়াসমিন ইভা। টাকাটা দিন। আর চোখ দুটি দিয়ে বললেন, ধন্যবাদ।

বুঝলাম উনি দূরদর্শী ও কম কথার মানুষ। কথা না বাড়িয়ে পাচশ টাকার তিনটি নোট দিলাম।

দুজনে এক সঙ্গে ক্যাশে টাকা জমা দিলাম এবং ডাক্তারের রুমের দিকে রওনা হলাম। দ্রুত সিড়ি ভাঙছি উপরে ওঠার জন্য।

পেছন থেকে ইভা বললেন, এতো তাড়াতাড়ি?

একবেলার ছুটি নিয়েছি, অনেক কাজ বাকি, আপনি?

আজকে ছুটি নিয়েছি মায়ের জন্য।

ডাক্তারের রুমে এসে ইভার মায়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম। মামাকে নিয়ে চোখের প্রেশার মাপাতে হবে বলে বললাম, চলি।

ইভা বললেন, আপনার হাতে মোবাইল, নাম্বারটা বলেন।

পকেট থেকে একটা কার্ড দিলাম। মামাকে নিয়ে বাইরে চলে এলাম।

পেছন থেকে ডাক এলো, শুনুন।

মামাকে রেখে এগিয়ে এসে বললাম, বলেন।

ধন্যবাদ।

চোখের দৃষ্টি ইভার পরিবর্তন হলো না আমার বুঝলাম না।

বললাম, আপনি গভীর এবং অমায়িক।

মুখস্থ কথা আমি পছন্দ করি না।

সরি। আসি। ধন্যবাদ।

হাসপাতাল পর্ব শেষ করে মামাকে বাসায় রেখে অফিসে ফিরে কাজে ডুব দিলাম। তিনটার পর পরই মোবাইলের রিং বেজে উঠলো। ধরলাম।

আমি ইভা। আপনি কি আজ সন্ধ্যায় আমার বাসায় আসতে পারবেন?

তার ফোন আশা করিনি। ভেবে ছিলাম পরের দিন ব্যাংকে গিয়ে টাকাগুলো নিয়ে আসবো। ভাবলাম তার তো এতো ব্যস্ত হওয়ার দরকার ছিল না।

বললাম, টাকাগুলোর জন্য আপনি বোধহয় খুব টেনশন করছেন।

কথা কম বলা আমি পছন্দ করি। মাকে সকালবেলার কথা বলেছি। মা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমার ঠিকানা লেখেন দয়া করে। ঠিকানা বলার পর বললেন, সন্ধ্যায় দেখা হবে। মায়ের সঙ্গে কথা বলবেন এবং আমার সঙ্গে চা খাবেন। রাখি।

এবার সত্যি সত্যিই অবাক হলাম। একদিনেই এতো পরিচয়ের কি হলো! কৌতূহলী হয়ে ভাবলাম, নিজের ওপর তার বোধহয় খুব নির্ভরতা।

সন্ধ্যা সাতটায় কলিং বেলে চাপ দিলাম।

ইভা দরজা খুলে ড্রয়িংরুমে বসতে বলে বললেন, আপনার দুর্ভাগ্য এবং আমি দুঃখিত।

প্রশ্নবোধক চোখে ইভার দিকে তাকাতে বললেন, আপনাকে ফোন করার কিছু সময় পরে আমার ফুপু এসে মাকে একটি জরুরি কাজে তার বাসায় নিয়ে গিয়েছেন। মা দুঃখ প্রকাশ করে আপনাকে জানিয়ে দিতে বলেছে। আপনি বসুন, আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।

আমি চা খুব কম খাই, একদম অভ্যাস নেই, বছরে হাতে গোনা দুই পাচবার হতে পারে যেখানে একদম এড়াতে পারি না। বললাম, আদৌ চা খাই না।

আজ খাবেন।

না। সরি। বিনীতভাবে বললাম।

অন্য কিছু খান।

না, ঠিক আছে, আমি আজ আসি।

আপনি খুব সরল এবং শক্ত।
আমি খুব সরল, শক্ত এবং বোকা।
ইভা এবার সোফায় বসে বললেন, বিয়ে করেছেন?
ইভার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পর বললাম, না। সম্ভবত আমার চোখ-মুখ লাল হয়েছিল।
বিয়ের পর বুদ্ধিমান হবেন। বয়স হয়েছে, বিয়ে করেন।
ছেলেমানুষি করছেন। আচ্ছা, আপনি কথা বলার সময় হাসেন না কেন?
ইভার মুখ শক্ত হয়ে গেল। সেভাবেই বললেন, আপনার সঙ্গে কথা বলার উৎসাহটা নষ্ট করবেন না।
সকালে হাসপাতালে দেখা না হলে উৎসাহ কোথায় পেতেন?
ব্যাংকে। কারণ আপনি টাকা ওঠাতে আসতেন। আচ্ছা আপনি চাকরি কতোদিন করেন?
দুই বছর তিন মাস।
তারপর ইভার যা জানলাম তা হলো বাবা নেই, বড় ভাই লন্ডন থাকেন। মাকে নিয়ে এ বাসাতে থাকেন। ১৯৯১-তে এসএসসি পাস। বর্তমান বয়স ঊনত্রিশ যা দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না। অর্থাৎ ইভা আমার চেয়ে দুই বছরের বড়।
ইভা চা নিয়ে এলো। নিন খান।
আমি চা খাই না।
আমি মাইন্ড করবো।
এতো সহজেই।
আমি শেষবার বলছি, খান।
আমি চা খাবো না।
ইভার চেহারা বদলে গেল। আমায় অবাক করে দিয়ে দুই কাপ চা পানির জগের ভেতর ঢেলে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, আপনি এবার যান।
আবার ছেলেমানুষি করছেন।
রেগে বললেন, ছেলেমানুষি করছি না, আপনি গেলে খুশি হবো। বলে চায়ের কাপ দুটি সজোরে মেঝেতে ছুড়লেন।
আপনি শান্ত হোন। আমি আপনার খুব কাছের কেউ না।
ইভা কেপে উঠলেন, সেটা আমার আগে বোঝা উচিত ছিল।
আচ্ছা আসি। রাতে ভালো করে ঘুমাবেন।
পরদিন সকাল সাড়ে নয়টায় মোবাইল বেজে উঠলো।
হ্যালো, আপনার টাকাগুলো নিয়ে যান।
রাগ কমেছে?
কথা নেই।
আবার বললাম, রাগ কমেছে?
আমি দুঃখিত। আমরা ভালো বন্ধু হতে পারি।
বললাম, আমি এখন আসছি না। বিকেলে আমায় সঙ্গে ঘুরতে যাবেন। অফিস থেকে বের হওয়ার সময় আমাকে রিং দেবেন।
সেদিনের পর থেকে আমরা ঘুরতে শুরু করলাম। আপনি থেকে তুমিতে এলাম। দুজনে দুজনের কাছে মুক্ত হলাম। দায়-দায়িত্ব, দাবি বাড়লো। তবে তা শুধু ওই ভালো বন্ধু হিসেবে। একটা পবিত্র ও শুদ্ধ সম্পর্ক হিসেবে।

অনেক কাছাকাছি এসেছি, সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু কামনার দৃষ্টিতে কোনোদিন কেউ কাউকে স্পর্শ করিনি। সৎ থেকেছি, একে অপরকে শ্রদ্ধা করেছি। লাভ হয়েছে, আমি আগের থেকে অনেক চা খাই। তবে সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে এই ঘটনাটি।

ইভার মা কুষ্টিয়া গেছেন কয়েকদিনের জন্য। গত নভেম্বরের ঘটনা। এক রাতে দশটার সময় ইভা ফোনে আমাকে তার বাসায় যেতে বললো।

গেলাম।

ইভা শাড়ি পরেছিল।

আমায় খানিকক্ষণ দেখে বসতে বলে বেডরুমে গেল। যখন সে বেরিয়ে এলো তখন দেখলাম অন্য ইভা। শুধু প্যান্টি ও ব্রা পরা। আমাকে ইশারা করলো।

ঊনত্রিশ বছরের ভরা যৌবন চোখের সামনে ফুটে রয়েছে। আকাশ থেকে পড়লাম। নিজেকে সামলে নিলাম এবং বললাম, ইভা কাপড় পরে এসো, না হলে আমি চলে যাবো বলে দরজায় পা বাড়ালাম। ইভা আমার পথ আটকালো, বললো, আমি আর পারছি না, আমায় গ্রহণ করো।

বিধাতাকে ধন্যবাদ, তখনো মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছিলাম। বললাম, এখন যদি তোমাকে ফিরিয়ে দিই বলবে আমি পুরুষ নই। যদি রাগ করি বলবে অমানুষ। বলে তার হাত ধরে বেডরুমে নিয়ে কাপড় এগিয়ে দিলাম। পরে নাও।

সে শান্ত হলো, আমার কথা শুনলো।

ড্রয়িংরুমে সোফায় পাশাপাশি বসলাম। অনেকক্ষণ পরে বললাম, এ রকম তো কোনোদিন দেখিনি। আমায় বলতে পারতে।

তারপর ইভা যা বললো তা আরো অদ্ভুত ও আশ্চর্য।

আমার চোখে চোখ রেখে বললো, আমি মা হতে চাই।

ভালো কথা। বিয়ে করো!

আমি আর বিয়ে করতে চাই না!

অনেক সহজে তুমি কঠিন কথা বলছো।

চার বছর আগে আমার বিয়ে হয়েছিল। তিন মাসের মাথায় আমাকে ডিভোর্স দিয়ে তার পুরনো প্রেমিকাকে নিয়ে বিদেশ চলে যায়। আমার স্বপ্ন, আশা, সুখ সব শেষ হয়ে যায়। এই কয়েকমাস তোমাকে এভাবে পেতে চাইনি। শুধু তোমাকে পড়েছি, বুঝেছি। আমি আবার স্বপ্ন দেখতে চাই।

বললাম, কিন্তু তুমি আমাকে লোভ দেখিয়েছো, ভালো বন্ধুত্বকে এক পলকেই নষ্ট করে ফেলেছো।

একটু ভেবে মাথা নিচু করে বললো, আমার ভুল হয়েছে। তুমি অন্য পুরুষ। প্রথম দিন দেখেই বোঝা গিয়েছিল। সে রাতে চায়ের কাপ ভেঙে দিলাম যাতে আমাদের মধ্যে কোনো কিছুর সৃষ্টি হয়।

তুমি অভিনয় করেছো?

বরাবরই মনে হয়েছে, তুমি আমায় ঘৃণা করবে না। ইভা বললো।

তাহলে?

তুমি আমায় বিয়ে করো।

তুমি জানো আমি হিন্দুর ছেলে।

এও জেনেছি তুমি এসবের ঊর্ধে। তুমি আমাকে একটা সন্তান দাও। আমি মা হতে চাই।

ইভা অঝোরে কাদতে শুরু করলো।

মগবাজার, ঢাকা থেকে

sujanbd555@yahoo.com

মায়ের মুখ

- মহসীন রেজা

আমাদের পরিবার এবং পরিবার সংশ্লিষ্টরা সবাই চা বাতিকগ্রস্ত। পাচ ছয় বছর বয়স থেকেই আমরা ভাইবোনেরা সকাল–বিকেল চা খেতে শুরু করি।

আমার দুই বোন। ইমিডিয়েট জুনিয়র বোনটা রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আর ছোটটার বয়স চার বছর। বড়টা দুপুরের দিকে ইউনিভার্সিটি থেকে বাসায় ফিরেই হাতে চায়ের কাপ নিয়ে টেলিভিশন খুলে বসে। চা পর্ব শেষ করার পর গোসল করবে এবং তারপর দুপুরের খাবার খাবে। কাঠফাটা গ্রীষ্মেও এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয় না। এ ব্যাপারে আমার মায়ের বকাবকি কোনো কাজে আসে না।

ছোট বোনটার কেচ্ছা–কাহিনী আরো বিদিক। আমার এই ছোট বোনটা চায়ে পাউরুটি ভিজিয়ে খেতে ভালোবাসে। চায়ের বদলে দুধ দিলে খাবে না।

একদিন আমার মা চায়ের সঙ্গে বেশি করে দুধ মিশিয়ে দিলেন।

আমার বোন তখন করলো কি, কিছু সময় চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে থেকে বড়দের মতো মুখ করে বললো, চায়ের রঙ শাদা কেন? আমি শাদা রঙের চা খাই না।

এরপর থেকে আমার মা আর কোনোদিন এই ধরনের চালাকির আশ্রয় নেননি।

এতোগুলো কথা বললাম, আমাদের চা বাতিকগ্রস্ততার কিছু নমুনা দেয়ার জন্য।

পড়াশোনা করার তাগিদে আমার পরিবার থেকে ছিটকে চলে আসি ঢাকায়। হস্টেল, মেসে থাকতে শুরু করি। নানান কিসিমের ছেলেরা আমার বন্ধু হতে থাকে। আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে থাকে নিজস্ব বন্ধুগোষ্ঠি। চা খাওয়ার পর্বগুলো সমাধা হতে থাকে বিভিন্ন টি স্টল বা হোটেল–রেস্তোরায়।

হুমায়ূন আহমেদের কোনো এক গল্পের নায়কের মতো আমরাও ঢাকা শহরের সবগুলো টি স্টলে চা খাওয়ার নিয়ত করি। এমনকি গল্পের নায়কের অনুকরণে যার বানানো চা সবচেয়ে ভালো হবে তাকে আমরা একটা পিতলের মেডাল দেয়ার কথাও চিন্তা করি। মূল গল্পে বোধহয় সোনার মেডালের কথা ছিল। যদিও সেটা কার্যে পরিণত হয়নি।

বছরের অধিকাংশ সময় ঢাকায় থাকার কারণে এবং এভাবে বাইরে বাইরে চা খেতে থাকার ফলে আমার হয়তো অন্য রকম একটা চায়ের রুচি তৈরি হয়ে যায়।

একদিনের ঘটনা। ছুটিতে বাড়িতে গিয়েছি। বিকেলে সবাই এক সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি। সুন্দর জলতরঙ্গের মতো পরিবেশ। হঠাৎই আমি বলে ফেললাম, নাহ! আম্মুর হাতের চা আর আগের মতো হচ্ছে না।

কোথাও কি ছন্দপতন ঘটলো!

কিন্তু আমার মায়ের ভঙ্গি সাবলীল। হাসতে হাসতেই বললেন, আমার হাতের চা তো এখন ভালো লাগবে না। হাসতে হাসতেই কিছুটা থেমে ইয়ার্কিমাখা সুরে আবার বললেন, বহিঃশত্রুর আক্রমণে পর্যুদস্ত বাংলা।

এবার সেই ছন্দের পতন টের পেলাম। শেষ কথাটা বলার সময় আমার মায়ের হাসিমাখা মুখে খুব সামান্য সময়ের জন্য হলেও বেদনার একটা ছায়া পড়েছিল।

ছুটি শেষ করে ঢাকায় চলে আসি। কিন্তু তারপর থেকে আমি আর বাইরে কোথাও চা খেতে পারি না। চায়ের কাপে মুখে নিলেই আমার মায়ের হাসি দিয়ে ঢাকা বেদনার্ত মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তেতো হয়ে যায় চায়ের স্বাদ।

এখন আমার চা খাওয়া হয় শুধু বাড়িতে গেলেই। মায়ের হাতে বানানো চা। আমার মা এটা জানেন না। এখন হয়তো জানবেন।

লতিফ

- রিজভী

নাম তার লতিফ। বয়স বড়জোর দশ। বাড়ি রংপুর। বাবার সঙ্গে ঢাকা এসেছে কাজের সন্ধানে। বাবা রিকশা চালান। তার রিকশা চালানোয় সংসার চলে না। মা হাপানির রোগী। তার পেছনেও ওষুধের জন্য একটা নির্দিষ্ট অংক বরাদ্দ রাখতে হয়। তাই দরকার কিছু বাড়তি টাকা। লতিফ তাদের বড় ছেলে। তাকে ঢাকা নিয়ে এসেছে কোনো কাজ ধরিয়ে দেবে। বিভিন্ন খোজাখুজি করে এক হোটেলে তাকে দিয়ে দিল। দুইবেলা খেয়ে মাসে দুইশ টাকা করে পাবে।

বাবা গিয়াসউদ্দিনের কাছে এটাও তো কম না, ছেলে মাস শেষে তাকে দুইশ টাকা করে দেবে।

মাঠে খেলতে যাচ্ছি, পেছন থেকে ভাইয়া ডাক। ফিরে তাকালাম। না, আমার পরিচিত কেউ না।

আবার ডাক এলো।

ভালো করে লক্ষ্য করতেই দেখি লতিফ। সবার পরিচিত মুখ লতিফ।

কি রে, কিছু বলবি নাকি?

ভাইয়া, আপনার কাছে একটি জিনিস চাইবো, কিনে দেবেন?

কম দামি হলে পারবো, বেশি দামি হলে পারবো না।

না, না মাত্র পনেরো টাকা দাম।

বল, আমার কাছে কি চাস তুই।

আমাকে একটা বল কিনে দেবেন।

ঠিক আছে, কখন দরকার, এখন?

এই বলে তাকে একটি বল কিনে দিলাম।

প্রতিদিন বিকেলবেলা হাটতে বের হলে কিংবা খেলতে গেলে লতিফের সঙ্গে আমার একবারের জন্য হলেও দেখা হবে। বিভিন্ন দোকানে চা-নাশতা দিয়ে আসে। আসা-যাওয়ার মাঝে মাঠের পাশে একদণ্ড দাড়ায়। সব সময় হাসিখুশি ভরা একটি গোলগাল মায়াবী মুখ। বড় সবাইকে ভাইয়া বলে যাকে। যেন তার আপন ভাই, তাতে নেই কোনো খাদ, আছে এক রাশ বিশ্বাস।

তার দোকানে গেলে সে আমাদের কয়েক বন্ধুর জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে যেতো।

আমরা সবাই তাকে খুবই আদর করতাম। পরে যতোটুকু জেনেছি, শুধু আমরা না, হোটেল মালিক থেকে শুরু করে অনেক অজানা লোকও তাকে আদর করতো। কেনইবা করবে না, এমন একটা নিষ্পাপ মায়াবী মুখের হাসি টাকায় কেনা গেলে তো কথাই ছিল না।

বল কিনে দেয়াতেই লতিফ আর আমার সম্পর্ক আরো গাঢ় হলো। আমি এখন তার দোকানে গেলে অনেক সময় জোর করে তার হয়ে কিছু খেতে দেয়। তার মালিক জেনেও কিছু বলে না।

প্রথম প্রথম মনে কষ্ট পাবে বলে খেতাম। পরবর্তীকালে শুধু এককাপ চা পান করতাম।

সে জানে, আমি চা পান করি না, এও জানে, তাকে খুশি করার জন্যই ওই চা পান করি।

এসব মধুর সম্পর্কের মাঝে তাকে আপন ভাইয়ের স্থান দিয়েছি।

সেও আমাকে তার আপন বড় ভাইয়ের মতো জানতো।

লতিফ তার ভালোবাসা এবং সরলতা দিয়ে এলাকার সবাইকে এতোই মুগ্ধ করলো যে, সবাই তাকে এক নামে চিনতো।

মুরুব্বিরা শয়তানি করে বলতেন, আগামীতে লতিফকে কমিশনার পদে দাড় করিয়ে দেবো।

সবার এ পরিচিতি তার জন্য অভিশাপ হয়ে দাড়ালো। যে চা সবার আস্থা যোগাতে সাহায্য করেছে সেই চা-ই আজ তার মনে বিষাদের ছায়া একে দিয়েছে।

কি রে তোর ডান হাতে কি হয়েছে। পুড়ে গেছে ভাইয়া।

তুই তো চুলার কাজ করিস না। তাছাড়া আজ দুই বছর পোড়া যায়নি, কাজ শেখার পর পোড়া গেল কিভাবে।

কি বলেন ভাইয়া, মানুষের কখন বিপদ আসে তা কি কেউ বলতে পারে। এই বলে সে যেন কিছু খুজতে লাগলো আর এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলো।

না, আমার বিশ্বাস হয়নি! পাঠক নিশ্চয় আপনাদেরও।

কিছু অসভ্য জানোয়ার লতিফের হাত পুড়িয়ে দিল। তার অপরাধ সে চা দিতে একটু দেরি করে ফেলেছে। চা আসার সঙ্গে সঙ্গে ওই গরম চা তার হাতে ঢেলে দিয়েছে।

প্রতিবাদ করার মতো সাহস কারো নেই।

মালিক তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ এনে দিলেন।

আমার কাছে লতিফ তবুও স্বীকার করেনি তার হাতে কারা চা ঢাললো, কেন ঢাললো?

তার কি দোষ ছিল? সে শুধু এটুকু বিশ্বাস করে, আমি শুনলে মনে কষ্ট পাবো আর সে চায় না আমি কষ্ট পাই।

মাঝখানে সে কিছুদিন আর দেখা করেনি। হঠাৎ একদিন আমার বাসায় এসে বললো, ভাইয়া, আমি চলে যাচ্ছি, কোন অন্যায় করে থাকলে মাফ দিয়ে দেবেন।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। মাঝখানে কয়েকটি দিনে তার অনেক পরিবর্তন এসেছে। আমি পারিনি তার মুখ থেকে তার আঘাতের কথা বলাতে, পারিনি তাকে ফেরাতে, পারিনি ভাইয়ের মূল্যায়ন জানাতে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছো লতিফ?

বাড়ি চলে যাচ্ছি, এখানে আর থাকবো না।

কেন, হঠাৎ এ সিদ্ধান্ত কেন!

আপনারা মানুষ ভালো না। দিনের আলোয় আপনারা ভালো আর অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের চরিত্রও বদলাতে থাকে।

তার হাতে ভাড়ার জন্য দুইশ টাকা দিলে সে ফিরিয়ে দিল।

ধিক্কার জানালো আমার টাকাকে। কখন আবার এ টাকার পরিশোধ নিতে যাই। দুটি কচি পা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে রইলাম পথের দিকে যদি আবার ভাইয়া বলে ফিরে আসে।

না, সে আসেনি আর। শুধু তাই নয়, তার হোটেল মালিক থেকে দুই মাসের পাওনা টাকাও নেয়নি।

বিবেকের মূল্যবোধের প্রশংসা জানাই আমার, আমাদের লতিফের। সে শুধু একা যায়নি সঙ্গে ঢাকা থেকে নিয়ে গেছে তার বাবাকে। তার বাবাকেও আর কোনোদিন দেখিনি।

এখন আর মাঠে ভাইয়া ডাক শুনি না। ধীরে ধীরে হয়তো তাকেও ভুলে যাবো।

সত্যিই মানুষ ভালো না আমরা।

মধ্য বাসাবো, ঢাকা থেকে

rejvei@yahoo.com

বাবার লাশ

– তোফাজ্জল

আমার বাবা গত ১ বৈশাখ ১৪১২–এ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। বাবার অভ্যাস ছিল রাত দুইটা আড়াইটার পর আর ঘুমাতেন না। তাহাজ্জুদ নামাজ, ফরজ পরে একটু ঘুমাতেন। সূর্যোদয়ের পর পর আপনিতেই বা কারো ডাকে জেগে উঠতেন।

আমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত কৃশ, লম্বাটে এবং ফর্শা। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় একশ নয় বা একশ দশ বছর।

পবিত্র কালাম নিয়ে যখন বসতেন তখন তার এক কাপ চা, সঙ্গে দুটি বিস্কিট বা অল্প মুড়ি চাই। সকাল দশটা পর্যন্ত তিনি থাকতেন। গ্রামের, এমনকি দূরদূরান্তের লোকজন নানা প্রয়োজনে তার কাছে আসতো।

বাবার মৃত্যুর পর তার লাশ চব্বিশ ঘণ্টা রাখতে হয়েছিল। দূর–দূরান্ত থেকে আপনজনেরা আসবে। তাই পরদিন ১৫ এপৃল দাফন কাফন সম্পন্ন করতে হবে। তখনই প্রয়োজন হলো চা এবং বরফের।

অনেকেই বললো, কফিন তৈরি করে তাতে লাশ রাখতে। কিন্তু আমি তা না করে পলিথিন কাগজ (একটু পুরু) দুই পার্ট করে মধ্যে চা সুন্দর করে বিছিয়ে তার সঙ্গে বরফ দিই।

বরফ ও চায়ের মিশ্রণের ওপর বাবার লাশ রেখে মুড়িয়ে দিই। দেখা গেল বরফ গলেনি। এক ফোটা পানিও বের হয়নি।

বাবার আদেশ ছিল, আমি যেন তার গোসল দিই, আমি যেন তার কাফন চড়াই, আমি যেন তার জানাজা পড়াই এবং কবরে নামাই।

তার সে আদেশ পালন করেছি। কোনো ভুল হয়ে থাকলে পরম করুণাময় যেন আমায় মাফ করেন।

কিশোরগঞ্জ থেকে

লি

- ফরিদা বেগম পপি

লি আমার খুব কাছের একজন বান্ধবী। কলেজে ওর খেতাব ছিল চাখোর। কারণ মাঠে–ঘাটে যেখানে বসে আড্ডা দিই না কেন, চা খেতে খেতে শুরু করবে আলোচনা। ওরা কড়া চা খায়। মানে লিকার বেশি। কলেজ মাঠের সব চা–ছেলেগুলো ব্যাপারটা জানে। তাই পাতাও সঙ্গে রাখে।

ঘটনাটি ২০০১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪ তারিখ, বৃহস্পতিবারের কাহিনী।

আমরা দুজনে মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। বৃহস্পতিবার কলেজ থেকে ফেরার পর থেকে তার মন বিষণ্ন। দুপুরে খায়নি। লক্ষ্য করলাম সন্ধ্যার দিকে হস্টেলের ছাদে এক কোণায় বসে আছে। আমার মনে হলো হয়তো কিছু হয়েছে রুক–এর সঙ্গে।

যাহোক, ভাবলাম, চা করে ছাদে উঠে ওর পাশে বসে কি হয়েছে শুনবো। চা খাওয়ার অনেকক্ষণ পর ফৃ হলো। কাদতে কাদতে বললো বৃহস্পতিবার কি হয়েছে রুক–এর সঙ্গে :

কলেজে বারোটার দিকে রুক আসে। বার বার করে বলতো একদিন ওর মেসে যেতে।

আমি যেতাম না। কারণ ভালো লাগতো না।

সে বললো, আজ তার শরীরটা ভীষণ খারাপ। পাশে কিছুক্ষণ বসলে তার ভালো লাগবে।

বাধ্য হয়ে গেলাম। কিন্তু আজ এই প্রথম দিনে তার সঙ্গে একই রিকশায় উঠলাম। আমার শরীরের একাংশ তার শরীরের সঙ্গে লাগছে আর আমার ভেতরে মৃদু কম্পন হচ্ছে। নরমাল থাকার চেষ্টা করছি। একদম চুপ।

সে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর অপলক চোখে হাসছে। আমি বুঝতে পারছি।

দেখতে দেখতে তার মেস এসে গেল। রিকশার ভাড়া চুকিয়ে রুক তাড়াতাড়ি রুমে গেল। ছড়ানো-ছিটানো কাপড়-চোপড়, চায়ের কাপ পড়ে আছে। একটি রুমের সঙ্গে বাথরুম। একটি ছোট কিচেন, গ্যাসের চুলা তার পাশে ছোট একটা ফৃজ। আমাকে বিছানায় বসতে বললো। একটু জড়োসড়ো হয়ে বসলাম আমি।

রুক বললো, চা খাবে?

বললাম, না থাক। কি, তোমায় তো সুস্থ দেখছি।

রুক একদম কাছে বসে বললো, তুমি এসেছো পাশে। তাই সুস্থ।

রুক আমার হাতটা ধরতেই চমকে উঠলাম। ভেতরে হৃদস্পন্দন থেমে যাচ্ছে। তার হাতের মধ্যে আমার হাতটা রাখতেই একটু উষ্ণতা অনুভব করলাম। আমি রুকের চোখের দিকে তাকাতে পারছি না। ভেতরে একটা কাপুনি বুঝতে পারলাম। সব কথা থেমে গেছে।

সে খপ করে আমার পায়ের কাছে বসে হাটুতে মাথা রেখে বললো, লি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। আমাকে গ্রহণ করো।

ঠিক বুঝতে পারছি না। প্লিজ, পাশে বসো। কি হয়েছে তোমার। রুক আমার গালে হাত দিতেই ওর হাতটা ধরলাম।

সে বলছে, আজ একটু আদর করবো।

বুঝতে পারছিলাম না আমার কি করা উচিত। তবে ভেতরে শিহরণ বুঝতে পারছি। এই প্রথম তার হাতটাকে জড়িয়ে ধরার স্বাদ অনুভব করলাম।

রুক আমাকে আদর করলো কপালে, গালে।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঠোটে আদর দিতেই ভীষণ বাধা দিলাম। সে আমার ঠোটে ঠোট রাখতেই কিছুক্ষণ পর অনুভব করলাম, পুরো শরীরটা সে আবিষ্কার করেছে।

আমার কান্না পাচ্ছিল, কি করবো বুঝতে পারছি না।

কিছুক্ষণ পর রুক আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো, ভালোবাসি, ভালোবাসি।

এই প্রথম তাকে ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরলাম। ঘাড়ে ছোট একটা আদর দিলাম। রুক বললো, চা দেই।

না করলাম না। তবে নিঃসঙ্গতা ফেরাতে চাইলাম, দুই কাপ চা খেয়ে ফেললাম। টেবিলের কর্নারে ছোট এক টুকরো কাগজ পড়ে থাকতে দেখলাম।

রুক এক সঙ্গে দুপুরের খাবারের জন্য অনুরোধ করলো, আমি শুনলাম না।

যতো তাড়াতাড়ি চলে আসা যায় সেটিই ভাবছিলাম। শরীরটা কাপছিল। রুককে না ডেকে মেস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। একবারও পেছন ফিরে দেখলাম না।

আজ কতোদিন হয়ে গেছে, যে কয়বার দেখা করতে চেয়েছে, আমি করিনি। কথাও বলিনি, ইচ্ছা হারিয়ে গেছে। লি তার বলা শেষ করলো।

আদি, আরেকটু চা দিবি, একটু কড়া করে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে লি বললো।

দশ পনেরো মিনিট পর এক মগ চা নিয়ে এলাম।

লি এক নিঃশেষে চা শেষ করলো।

বললাম, লি তোমার কি দেখা করা উচিত নয়, তুমিও তো কষ্ট পাচ্ছ।

লি অনেকক্ষণ পর চায়ের মগ পাশে রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, আদি, সে ছিল বিবাহিত।

শ্যামলী, ঢাকা থেকে

লবণ চা

- নুসরাত জাহান নুপুর

অনেক দিন পর ফুপাতো বোন হাসিআপু ও দুলাভাই এলেন বেড়াতে। তারা এলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। সারা দিন নিসার (ভাগ্নি) সঙ্গে চলে দুষ্টমি আর রাতে আপু, দুলাভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা। তারা দুই তিন বছর পর পর বরিশালে বেড়াতে আসেন। তারা এলে দিনগুলো যে কিভাবে কেটে যায় বুঝতে পারি না।

একদিন রাতে আমরা সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম। দুলাভাই মেরীআপুকে বললেন, আড্ডায় চা না হলে আড্ডা জমে না।

হাসিআপু ধমকের সুরে দুলাভাইকে বললো, আসার পর থেকে তুমি মেরীকে ধীরেসুস্থে এক মিনিটও বসতে দাওনি। এখন আবার বলছো চায়ের কথা।

সমস্যা নেই, আমি চা বানিয়ে নিয়ে আসছি বলে মেরীআপু উঠতে গেল।

বললাম, ঠিক আছে, তোমরা গল্প করো আমি চা বানাতে যাচ্ছি।

চা বানিয়ে নিয়ে এসে শুনি দুলাভাই এক কাপ চা তার বন্ধুদের সঙ্গে কিভাবে ভাগাভাগি করেছেন তার গল্প করছন।

আমাকে দেখে বললেন, দেখেছো, একেই বলে কাজের মেয়ে। কতো দ্রুত চা বানিয়ে নিয়ে এলো। মেরীআপুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কি চশুমুদ্দিন (মেরীআপু চশমা পরে বিধায় ওকে...), তুমি পারবে এতো দ্রুত চা বানাতে?

মেরীআপু চিৎকার করে উঠলেন, দুলাভাই, ভালো হচ্ছে না কিন্তু!

এ কথার ফাকে হাসিআপু ও দুলাভাইকে চা দিলাম এবং নিজেও এক কাপ নিলাম।

দুলাভাই এক চুমুক খেয়েই দারুণ, অসাধারণ, বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন আর বললেন, জীবনে লেবু চা, রঙ চা, আদা চা অনেক চায়ের স্বাদই পেয়েছি। কিন্তু আজকের মতো এমন চায়ের স্বাদ আর কখনোই পাইনি।

বললাম, অসাধারণ তো হতেই হবে। কারণ আমার ছোয়া লেগেছে!

দুলাভাই মুচকি হেসে বললেন, সব কিছুই ঠিক ছিল ছোট গিন্নি। কিন্তু লবণটা একটু বেশি হয়েছে।

আমি কিছু বলতে যাবো, তার আগেই হাসিআপু বলে উঠলেন, আচ্ছা, বলো তো এদেরকে ক্ষেপানো ছাড়া তোমার আর কি কোনো কাজ নেই! এবার হাসিআপু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভ্রূ কুচকিয়ে ফেললেন এবং বললেন, নুপুর, আমার মনে হচ্ছে তোর কোথাও ভুল হয়েছে। তোর দুলাভাইয়ের কাপটা আমাকে দিস নি তো।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, দুলাভাইয়ের কাপ মানে! তিনটি কাপই তো এক রকম।

হাসিআপু আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর দুলাভাইয়ের চায়ে লবণ দিয়েছিস?

বললাম, না তো!

তারপর আমার চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। কিন্তু এতো লবণ কেন! এবার বুঝতে পারলাম ভুলটা কোথায় হয়েছে। আমি হয়তো চায়ে চিনির বদলে লবণ দিয়েছি। আর দুলাভাইয়ের কথার অর্থ বুঝতেও কোনো সমস্যা হলো না।

ব্যাপারটি জানতে পেরে সবাই হাসাহাসি শুরু করলো।

তারপর থেকে দুলাভাই যতোদিন ছিলেন ততোদিন আমাকে ডেকে ডেকে বলতেন, ছোট গিন্নি, এক কাপ লবণ চা হবে!

এ কথা শুনে মেজাজ ফরটি নাইন হয়ে যেতো।

আর তার মেয়ে নিসা, আমার হাতে চায়ের কাপ দেখলেই হলো, অমনি বলবে, নুপুর আন্টি, নুপুর আন্টি, চা খাচ্ছো দবন (লবণ) দেবো, দবন।

অবাক হয়ে ভাবতাম, এই পিচ্চি মেয়েটাও আমাকে নিয়ে মজা করে! তখন নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল। কেন যে সেদিন চা বানাতে গেলাম!

কলেজ রোড, বরিশাল থেকে

শক্ত হাত

- মোহাম্মদ কাওছার হোসেন

আমি সশস্ত্র বাহিনীর একজন সদস্য। তখন আমার কর্মস্থল ছিল সৈয়দপুর নীলফামারীতে। ঘটনাটি ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসের। প্রচণ্ড শীত চারদিকে।

বাংলাদেশে শীতকালে ঠাণ্ডার দিক থেকে যে জায়গাটি ভয়ংকর হয় সেটি হচ্ছে এই সৈয়দপুর। টেলিভিশনে আবহাওয়া সংবাদের সময় যখন ঘোষণা হয় যে, আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সৈয়দপুর ১০ সেলসিয়াস তখন আমার মনে হয় যেন মিথ্যা বলছে। বাস্তবে হিমাংকের নিচে তাপমাত্রা সব সময় থাকে মনে হয়।

তখন আমি বাস্কেটবল টিমে নতুন সদস্য, তাই প্রথম বেশ ইচ্ছা সহকারে খেলা শিখছি। কারণ এর আগে স্কুল ও কলেজ জীবনে শুধু এটার নাম শুনেছি। মাঝে মধ্যে ইংরেজি ও হিন্দি ফিল্মগুলোতে দেখতাম। কদাচিৎ স্পোর্টস ক্লাবগুলোতে গেলে ডিশের কল্যাণে টিভিতে বসে দেখতাম এবং মজা পেতাম। বিশেষ করে বড় ডি–র দাগ বেয়ে স্ট্রাইকারদের বল নিয়ে ঢুকে লেআপ করে রিংয়ের মাধ্যমে স্কোরিং অথবা ফ্র শর্টে তিন অথবা দুই পয়েন্ট করার আপ্রাণ চেষ্টা।

অপর পক্ষে ডিফেন্ডারদের চরম বাধা দেয়া। অথচ এরই মাঝে চোখের পলকে স্কোর হওয়া বা বিপক্ষ দল বল হাতে পাওয়া মাত্র মুহূর্তেই তাদের বিপক্ষ দলের কোর্টে গিয়ে স্কোর করা। চমৎকার একটি খেলা। অত্যন্ত বিচক্ষণ হতে হয় এতে।

যাই হোক, খেলা শেখার এক পর্যায়ে খুব সকালে আমাদের প্র্যাকটিস শুরু হলো। সেদিন এতোই তাপমাত্রা ঠাণ্ডা ছিল যে, ট্রাউজার্স সেটাও যেন হার মেনেছে। ভেতরে শুধু গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট। যতোই লাফঝাপ দিয়ে ব্যায়াম করি না কেন, কিছুতেই কিছু কাজ হচ্ছে না।

তারপর আবার শুরু হলো ভীষণ হিম প্রবাহ, সঙ্গে বৃষ্টি।

আর যায় কোথায়?

সব চলে গেলাম মেসে। ঠাণ্ডায় পুরো শরীর কাপছে। নাশতা দিল গরম গরম। কিন্তু খাবো যে চামচ দিয়ে তা আর সম্ভব হচ্ছে না। কারণ আঙুলগুলো এতোই জমে গিয়েছে যে, বাকা হতে চায় না।

অগত্যা হাত দিয়েই শুরু করলাম। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, হাতে এতোটুকু গরম অনুভূতি হচ্ছিল না। কিন্তু জিভ ঠিকই টের পেয়েছিল।

এবার চা খাওয়ার পালা। আর তখন ঘটলো অঘটনটি।

একটা রাইস ডিশের মধ্যে পানির সঙ্গে কাপ ছিল। কাপটি বাম হাত দিয়ে পানি থেকে তুলে আনতে গেলাম। কাপ ধরলাম ঠিকই কিন্তু পানি থেকে তুলে আনার সময় মনে হলো যেন দক্ষিণ মেরুর বরফস্তর থেকে হাত বের করছি।

কাপে চা রাখার জন্য ডান হাতে যেই না ফ্লাস্কের বাটনে হাত প্রেস করেছি, তার আগেই ঠাশ করে একটু শব্দ হলো। চোখের নিমেষে কাপটি হাত থেকে পরে ভেঙে চুরমার। শত চেষ্টা করেও যেন ধরে রাখতে পারলাম না, বিফল হলাম। মনে হয় তিন চারশ ভূত ও জিন কাপটি আমার বা হাত থেকে টেনে নামিয়ে ফেলে দিল।

পরবর্তী কাহিনী আরো কঠিন। আদেশ জারি হলো, সেই ধরনেরই কাপ কিনে দিতে হবে। নমুনা হিসেবে একটা কাপ নিয়ে সারা সৈয়দপুর শহর ঘুরলাম। কিন্তু না, কোথাও পেলাম না।

দোকানদারদের কেউ কেউ বললো, রংপুর গেলে পেতে পারেন। কিন্তু রংপুরেও একই অবস্থা। মডেল মেলে তো রঙ আলাদা, রঙ মেলে তো মডেল ঠিক নেই। নিরাশ হলাম, টেনশনও বেড়ে গেল। কারণ সরকারি জিনিস!

টিমের অনেকে বললো, বগুড়ায় যা। বললাম, কবরে যাবো। শালারা, পঞ্চাশ টাকার এক কাপের জন্য বগুড়া যাবো, না?

তাহলে কি করবি?

তোদের মাথা চাবাবো। বলে বেরিয়ে গেলাম।

ওরা বললো, আমাদের মেসের সিনিয়র স্টাফের কাছে আর গালমন্দ শোনাবি না।

বললাম, ওকে বয়েজ, Ok Boys।

দশ দিনের ছুটি কাটিয়ে সরাসরি সিনিয়র স্টাফের মুখোমুখি হলাম।

কি রে, কাপ কই?

বললাম, স্টাফ, ঢাকা পর্যন্ত গিয়েছি। কতো ক্রোকারিজ শপে খুজলাম। কিন্তু ব্যাড লাক।

এখন কিছু একটা ব্যবস্থা করুন। নামটি কেটে ফেলুন প্লিজ।

স্টাফ আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। বললেন, পাগল, মিথ্যা বলছিস কেন? মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন যা, তোর কিছু হবে না, নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চাশ টাকা রেজিস্টারে জমা করে নামটা কাটাবি, কেমন! আর এখন থেকে কাপ শক্ত হাতে ধরবি।

কোন হাত?

বললাম, শক্ত হাত।

ওদিকে প্রচণ্ড শীতের মাঝে ড্রেস লাগিয়ে আবার প্র্যাকটিসে ডাক পড়লো।

সেনুয়াপাড়া, ঠাকুরগাঁও থেকে

বিটি সিক্সটিন

- কায়েছ আহমেদ

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে চা রফতানি করা হয়। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান প্রতি বছর দশ মিলিয়ন কেজি চা আমদানি করছে। তবে চা শিল্প বেশ সংকটে পড়েছে।

১৯৯৭–১৯৯৮ অর্থ বছরে চা রফতানি হয়েছিল আড়াই কোটি কেজির মতো। ১৯৯৮–১৯৯৯ অর্থ বছরে দুই কোটি পয়ত্রিশ লাখ কেজির মতো। ১৯৯৯–২০০০ অর্থ বছরে চা রফতানি হয়েছিল এক কোটি ছাব্বিশ লাখ কেজির মতো।

অথচ ১৯৮০ সালে প্রায় তিন কোটি কেজি চা বিদেশে রফতানি করা হয়েছিল।

বর্তমানে চা উৎপাদন হচ্ছে ছয় কোটি কেজির মতো। দিনে দিনে আমাদের চা পানের অভ্যাস বেড়ে যাওয়ায় দেশে চাহিদা পূরণ করে এক কোটি বিশ লাখ কেজি চা রফতানি করা হয়।

মূল কথা হলো চা উৎপাদন বাড়াতে হবে। বৃটিশ আমলে তৈরি হওয়া চা বাগানগুলোর বেশির ভাগই রুগ্ন হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে প্রায় একশ বাষট্টিটি চা বাগান আছে। চা উৎপাদনে এই একশ বাষট্টিটি বাগানকে আগ্রহী হতে হবে।

চা গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা একটি নতুন জাতের চা উদ্ভাবন করেছেন। জাতটির নাম বিটি-সিক্সটিন (বিটি-১৬)। যখন এই জাতের চা মুখে দেয়া হবে তখন ভিন্ন ধরনের একটি কড়া আমেজ পাওয়া যাবে।

সাধারণত হেক্টরপ্রতি এক হাজার দুইশ সত্তর কেজি চা উৎপাদন হয়। কিন্তু বিটি-সিক্সটিন নামের নতুন জাতটির হেক্টরপ্রতি তিন হাজার কেজি চা উৎপাদন করা সম্ভব হবে যা আগের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

তাই একশ বাষট্টিটি চা বাগানের সবাই যদি বিটি-সিক্সটিন নামের চা-টি গ্রহণ করে তাহলে বাংলাদেশে চা রফতানির ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ হবে।

আশা করা হচ্ছে, বিটি-সিক্সটিনের পাশাপাশি বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা আরো নতুন জাতের চা উদ্ভাবন করবেন।

মৌলভীবাজার থেকে

মুকুলের চা

- নীলাক শাবীন

ছেলে : বাবা ওরা কি খায়?

বাবা : চা।

ছেলে : আমি চাইলে দেবে না – তুমিই চাও।

বহুল প্রচলিত এই কৌতুকের ছেলে চা না চিনলেও মূলত চা চেনে না এমন ব্যক্তি বিরল। সেই কতোকাল আগে বৃটিশরা চায়ের প্রচলন করেছিল এ অঞ্চলের মানুষকে ফৃ খাইয়ে। চা বাগান, শ্রমিক, মজুর, মালিকের দ্বন্দ্ব, খুন এসব ইতিহাস বিদায় নিয়েছে। এখন চা আর ফৃ পাওয়া যায় না। রাস্তার পাশের টঙ দোকানের রঙ চা-ও এখন দুই টাকা, দুধ চা তিন টাকা কাপের সাইজও বটে একখান! লিলিপুটিয়ান।

কাপের আংটায় আর আঙুল ঢোকে না দুই আঙুল দিয়ে টিপে ধরতে হয়। চাইলে পুরো কাপসহ বেমালুম গিলে ফেলা যায়।

এ চা অনেকেরই প্রিয় পানীয়, আমার নিজেরও। এই চা-প্রিয়তার জন্য আমার পরিবার অনেকাংশে দায়ী। আমার জন্মের পর বোধ হওয়া থেকে দেখে এসেছি ভাত, পানি সময় মতো না খেলেও চা পানের কোনো কামাই নেই। এনিটাইম টি টাইম (Anytime tea time)।

আমিও বংশধারা রক্ষার্থে চা পান শুরু করলাম সোৎসাহে। বার বার চা করার বিড়ম্বনা থেকে বাচতে ব্যবহার হতো বড় ফ্লাস্ক।

আব্বা বাজারের সাধারণ চায়ের কাপে চা পান করতেন না। তার ছিল বড় মগ, মাও তথৈবচ।

চাকরিগত অবস্থান ও লোকপ্রিয়তার কারণে আব্বার কাছে সর্বক্ষণই প্রায় মানুষজন আসা-যাওয়া করতো। কিছু না হলেও এক কাপ চা ছিল কমন আইটেম।

এমনো অনেকে ছিলেন শুধু একটু মান সম্মত চা পানের জন্য আমাদের বাড়িতে হানা দিতেন। আমার মা হলেন চায়ের মহা কারিগর। আমার মায়ের বানানো চা পান করেনি পরিচিত সুধীজনের মধ্যে এমন ব্যক্তি বিরল।

যখন ক্লাস নাইন টেনে পড়ি তখন আমার কাছের বন্ধু-বান্ধবের কেউ কেউ উদাস উদাস, কবি কবি, প্রেম প্রেম ভাবে মজে গেল। এমন পরিস্থিতিতে আমাকেও অনেকে দিওয়ানা সন্দেহ করলে তাদেরকে বলতাম, দেখো আমার জীবনের তিন অংশের একাংশে আছে চা, একাংশে গান, আরেক অংশ নির্ভেজাল পতিত জমি বা উন্নত পোতাশ্রয় যেখানে এখনো কোনো আবাদ হয়নি, ভিড়েনি কোনো জাহাজ।

আমার বড় বোন ও হবু দুলাভাই পড়তেন ময়মনসিংহ মেডিকাল কলেজে। আমাদের বাড়ি সাতক্ষীরা জেলায়। তাদের মুখে ময়মনসিংহের নদী, রাজবাড়ীর গল্পের পাশাপাশি শুনতাম *মুকুলের চা*–এ গল্প।

ম্যাপে ময়মনসিংহের অবস্থান দেখে মনটা হাহাকার করতো। মনে হতো কবে যাবো ময়মনসিংহে, কবে পাবো মুকুলের চা, নদীর পাড়, কাশফুল, রাজবাড়ী।

আপা–দুলাভাই পাস করে ডাক্তার হয়ে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন নীলফামারীর সৈয়দপুরে। তখন আমি স্থানীয় সরকারি কলেজে পড়ি। একদিন সাতক্ষীরা হয়ে যশোর থেকে আন্তঃনগর ট্রেনে চেপে ভোরবেলা পৌছলাম সৈয়দপুর। ঘুম ঘুম ভাব, শিশির পড়া ভোরে দেখি স্টেশনেই চলছে চা বিক্রি। তখনই এই চা দাও তো এক কাপ – এও আরেক অভিজ্ঞতা। বিহারিদের তৈরি বিখ্যাত সর ভাসা দুধের চা, মিষ্টি একটু বেশি, তবু মনে হলো অমৃত। এক কাপে কি মন ভরে। দাও আরো এক কাপ।

ওরে বাবা, এতো দেখি শরবত করে দিয়েছে একেবারে। অগত্যা চায়ের কাপ বাড়িয়ে বললাম, চিনি বেশি হয়েছে, একটু ভালো করে দেন। সেই ভালোর মানে কি জানেন? চিনি আগে যদি দিয়ে থাকে তিন চামচ, এবার দিয়েছে ছয় চামচ!

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে কয়েকটা স্পট ছিল চা পানের। আমাদের হল থেকে দূরে যাওয়া লাগতো সেই চা পান করতে। অবশ্য হলের নিচ তলায় দুটো দোকান ছিল। শহীদের চা যদিও বা পান করা যেতো, কালুর চা ছিল জঘন্য। এ জন্য আমরা প্রায়ই দ্বারস্থ হতাম কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পেছনে বকুল তলায় *নাইস টি* পানের জন্য। এই নাইস টি–র বিশেষত্ব হলো চায়ের সঙ্গে পাচ, ছয় দানা নেসক্যাফে কফি বেশ লাগতো। না চা, না কফি, নাম দিয়েছিলাম *চাফি*।

ইউনিভার্সিটিতে আমাদের বন্ধু লাবিন–এর ভাগ্নের চা সম্পর্কিত একটি সত্য গল্প শুনে খুব ভালো লেগেছিল। গল্পটা এ রকম –

লাবিন তার ভাগ্নেকে নিয়ে বেড়াতে গেছে এক বাড়িতে। চা পর্ব এলে ছোট ভাগ্নে ধীরে ধীরে সবটুকু চা গলাধঃকরণ করে একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত হলে লাবিন সামান্য ভর্ৎসনা করে বললো, কাপ শেষ করে চা খাওয়া অভদ্রতা, ভদ্রতা হলো কিছু চা রেখে দেয়া।

এমতাবস্থায় ভাগ্নের মুখে শেষ যেটুকু চা ছিল তা পুনরায় কাপের মধ্যে পিচিৎ করে ফেলে ভদ্র হাসি দিয়ে বললো, আন্টি এটুকুতে ভদ্রতা হবে না?

আল্লাহ কখনো কখনো মানুষের মনের সুপ্ত বাসনাগুলো বাস্তবায়ন করে। আমার চাকরি জীবন শুরু হলো ছেলেবেলার স্বপ্নের শহর ময়মনসিংহে চাকরিতে যোগদান করে। একটু ধাতস্থ হয়েই ছুটলাম মুকুলের চা–এর খোজে। ভাবলাম এতোদিন পরে হয়তো মুকুলের চা আর পাবো না। আমার চাকরিস্থল ময়মনসিংহ থেকে সাত কিলেমিটার দূরে দাপুনিয়াতে। ওখান থেকে সদরে এসে কোথায় খুজবো, কার কাছে শুনবো! অগত্যা এক বইয়ের দোকানে খোজ করতেই দেখলাম সে চেনে।

ঠিকানা জেনে দুর্গাবাড়ি রোড ধরে মোড়ের কাছে এক ওষুধের দোকানে খোজ নিলে সেই দেখিয়ে দিল ওই যে মুকুলের দোকান।

আমার বিশাল ভাবনা ও স্বপ্ন যেন পাংচার হওয়া টায়ারের মতো চুপসে গেল। দেখলাম আড়াই বা তিন ফিট প্রশস্ত চিপা একটা ঘর। ভেতরে দশ ফিট লম্বা হবে, কিছু লাকড়ি, টুকিটাকি, দুই একটা ছোট টুল আর রাস্তার পাশের দিকে একটা বড় চুলা, দুইটা বড় কেৎলি, একটা বালতি এবং একটা বারো তের বছরের ছেলে দাড়িয়ে আছে পাশে।

কিছুটা বেদনাহত হয়ে বললাম, এটাই কি মুকুলের দোকান?

উত্তর এলো, হ্যা।

মুকুল কই?

সে বললো, সন্ধ্যার পর আসবে।

এখন চা পাওয়া যাবে কি না শুনলে বললো, সেই করে দিতে পারবে।

ফিরে এলাম কর্মস্থলে। সন্ধ্যার পর পরই সুযোগ করে আবারও গেলাম। কিন্তু কেমন যেন অচেনা মনে হলো জায়গাটাকে। সকালের উজ্জ্বল আলোতে খা খা শূন্যতায় ঘেরা স্থানটা সন্ধ্যার আধারে গম গম করছে মানুষজনে। রাস্তার ওপর রীতিমতো ভিড় জমে আছে। যানজট হচ্ছে মাঝে মধ্যে। এরই মাঝে দেখলাম কোকড়ানো চুল, ফর্শা রঙের এক লোক নিবিষ্ট মনে চা বানিয়ে চলেছে দাড়িয়ে। বয়স আন্দাজ করা গেল না। ছোট দুই তিনটা ছেলে তৈরি চা নিয়ে ছুটে ছুটে নির্দিষ্ট মানুষের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে যেন কোনো ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের চা পানের প্রতিযোগিতা।

আমিও দাড়িয়ে পড়লাম এক ধারে, অর্ডার দিলাম। কিন্তু চায়ের সিরিয়াল পাওয়া দায়। পাক্কা বিশ মিনিট পর এক কাপ চা পৌছালো হাতে, তাও অদ্ভুত ভঙ্গিতে, ছোট্ট এক কাচের গ্লাসে চা। ওই চা ভর্তি গ্লাস আরেক গ্লাসের ভেতর বসানো গরম প্রটেকশন এর জন্য। একি! শুধু দেখবো, না পান করবো ভাবতেই চায়ের সুন্দর গন্ধ এসে মন আকুল করলো। চুমুক দিতেই বুঝলাম মুকুল–এর সার্থকতা।

বৃথা হয়নি আমার আশা। পরে জেনেছি মুকুল চা তৈরি শুরু করে সন্ধ্যার পর থেকে। তারও আগে থেকে ওখানে ভিড় জমে মেডিকাল, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আনন্দমোহন কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের। আর স্থানীয় দোকানগুলোতেও চা–এর চাহিদা থাকে। মুকুলের রঙ চা ও দুধ চা দুটোই তৃপ্তিদায়ক।

আমি বহুদিন তার দোকানে গিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে তার শৈল্পিক চা বানানো দেখেছি। সাধারণ কনডেন্সড মিল্ক ও লুজ চাপাতা দিয়ে করা চা। তবুও অসাধারণ। আর লেবু ও আদার এক রহস্যময় মিশ্রণে হয় রঙ চা, সেও অসাধারণ।

মুকুলের দোকানের বিশেষত্ব হলো বসার কোনো ব্যবস্থা নেই। রাস্তার দুপাশে দাড়িয়ে বা অন্য দোকানে বসে তার চা পান করা লাগে। সন্ধ্যা থেকে শুরু করে রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত চলে একনাগাড়ে মুকুলের হাত। মুখে এক অমায়িক হাসি, নেই কোনো বিরক্তি ভাব।

একান্তে একদিন তাকে বলেছিলাম, সকালে বা বিকেলে কেন সে দোকানে আসে না।

উত্তর হলো, সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত একটানা চুলার গরমে ও চা বানানোতে সে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই বাকি সময়টা সে সংসারের কাজকর্ম করে ও রেস্ট নেয়।

আমার বোন ও দুলাভাইয়ের কথা শুনে ও দূর থেকে চা পান করতে আসি জেনে সে আমাকে একটা বাড়তি সুবিধা দিতো। তা হলো, গোপনে সিরিয়াল ভেঙে আমার হাতে পৌছে দিতো তাজা, সতেজ, সুগন্ধ ভরা এক কাপ চা।

ধন্যবাদ মুকুলভাই।

মানিকগঞ্জ থেকে

উত্তাপ

– দেবী

কিছুদিন আগে পৃন্সিপাল অফিসে ট্রেনিংয়ে যাওয়ার পর প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় একটি করে এসএমএস (SMS) শর্ট মেসেজ, মোবাইল ফোনে) পেতাম এবং উত্তর দিতাম। অলিখিত চুক্তির মতো হয়ে গেল ধীরে ধীরে। কিন্তু কোনোদিন কল (Call) দিয়ে কথা হয় না।

এরই মধ্যে একদিন আমার খুব মন খারাপ ছিল একটা ব্যাপারে। এতোই মন খারাপ যে, একা কাদছিলাম। ঠিক সেই সময় ওর SMS।

উত্তর পাঠালাম এই প্রথম বাংলা ভাষায় রোমান অক্ষরে। জানালাম মনটা ভীষণ খারাপ।

সঙ্গে সঙ্গে ও এই প্রথম ফোন করলো।

ও যে আবেগে কাপছিল তখন নিজের মন প্রচণ্ড খারাপ থাকলেও বুঝতে পারছিলাম। তবু সাহস করে ফোন করেছে। বুঝতে বাকি রইলো না কিছু। আগে থেকেই ভাবতাম SMSগুলো পাঠায় শুধুই কি এমনি এমনি, নাকি অন্য কিছু। কারণ ইংরেজি ভাষা, এমনি একটি ভাষা আমার কাছে মনে হয় বহুরূপী।

যেমন Darling কথাটি আমরা বাঙালিরা সাধারণ প্রেমিক বা প্রেমিকাকে বলে থাকি। কিন্তু যারা ইংরেজির Practice করে তারা জানে এটা প্রিয় যে কাউকেই বলা যায়। আমি সেভাবেই নিতাম। ভাবতাম বিদেশ যাওয়ার লক্ষ্যে ইংরেজির কোর্স করেছে, তাই হয়তো এমন সম্বোধন করে। Really I miss you, I feel you, You are the light of my life. এ ধরনের SMS দিতো। ওর ভালো লাগা Feelingsগুলো শেয়ার করতো আমার সঙ্গে।

ছোটবেলা থেকে একই মাটি, আলো, বাতাসে বড় হলেও অর্থাৎ কাছাকাছি বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও যা কখনো মাথায় আসেনি, আমি একটু উদার মনেই এনজয় করতাম এবং রিপ্লাই দিতাম ঠিক সেভাবেই। মেসেজগুলো পড়ে ওর বাস্তব স্বভাবের সঙ্গে মেলাতে পারতাম না।

ওর রুচি সম্বন্ধে আমার ধারণাই পাল্টে গেল। অত্যন্ত অন্তর্মুখী স্বভাবের ও। বাইরে থেকে যে কেউ ভাববে, কথাই জানে না। আসলে কারো সঙ্গে সত্যিকারের বন্ধুর মতো প্রাণ দিয়ে মিশতে পারলেই তার হৃদয় ছোয়া যায়।

আস্তে আস্তে সম্পর্কটা ঠিক বাবুর মতোই হয়ে গেল।

ট্রেনিং শেষে আবার অফিসে জয়েন করার পর ওদের নির্দিষ্ট স্থানে নিত্যদিনের আড্ডায় প্রায় প্রতিদিনই দুই চার মিনিট কথা হয়। কিন্তু সবাই খুব ফ্রেন্ডলি কথাবার্তা বললেও ও শুধু ওই রহস্যময় হাসি ভরা মুখে দাড়িয়ে থাকে চুপচাপ। মাঝে মধ্যে দুই একটা উত্তর দেয়। বয়সে কাছাকাছি হওয়ায় তুই, তুমি কিছু না বলে যতোটুকু কথা বলা যায়।

একদিন কাছের সিনেমা হলে তখন খায়রুন সুন্দরী নামে ছবি চলছিল। আমি বাড়ি এসে সন্ধ্যার দিকে মেসেজ পাঠালাম Hi Romeo! Ek cap cha hoye jak. naki sudhu khairun sundorider dekhileye cholbe?

ঠিক বছর খানেক পরের কথা।

সেই এক কাপ চা আজ অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আমার বেডরুমে। রোমিও অর্থাৎ আমার পতিদেবের বাড়ির বেডরুমে। দুই পরিবারকে এক মতে আনতে সে কি প্রাণান্ত চেষ্টা দুজনের! দুজনের এক কথা, নিজেরা একা কিছু করবো না। কিন্তু পারিবারিকভাবে এখানে না দিলে বিয়ে বন্ধ। লিডার আবদুল জলিলের আলটিমেটাম বিফল হলেও আল্লাহর প্রতি আমাদের পূর্ণ ঈমানের ফলে আজ আমরা বাবা-মায়ের দোয়া নিয়েই সফল হয়েছি।

বৃহস্পতিবার হাফ অফিস বিধায় বিকেলবেলা চলে এসেছি। ওর কাজগুলোও সেভাবেই রাখে যেন বৃহস্পতিবার, শুক্রবার দুজনকে পুরোপুরি সময় দেয়া যায়।

দুজন রেস্ট নিচ্ছি। হঠাৎ ও বললো, দেবী, এক কাচ চা হবে?

তাড়াতাড়ি দুই কাপ চা বানিয়ে আসতে আসতে দেখি ওর প্রিয় আইয়ুব বাচ্চুর হৃদয়ে ঝড় তোলা বাছাই করা গান ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওকে ঘুম থেকে জাগানোর আমার নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে। সেটা শুধু আমরা দুজন জানি। হাতের আঙুলটি নিয়ে গরম চায়ে হালকা ছোয়া দিলাম। কিন্তু নড়ছে না। এতো গভীর ঘুমিয়ে গেল এই অল্প সময়ে? ওকে চা-টা না খাওয়ানো পর্যন্ত যেন আমার শান্তি নেই। তাছাড়া ওকে ঘুমাতে দিতেও ইচ্ছা করছিল না।

বাইরে বৃষ্টি। তাই শ্বশুর-শাশুড়ি ও ননদরা যার যার ঘরে। এবার চুলে হালকা করে নাড়া দিলাম। কপালে আলতো কিস করলাম। লোমশ বুকে হালকা কামড় দিলাম। নাহ! এতো ঘুম কেন!

এবার কড়া ডোজ দিতে হবে ভেবে সোজা ওর ওপর নিজের সারা শরীরের ভার দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কারণ যতোই ঘুমাক না কেন, হঠাৎ একজনের শরীরের সম্পূর্ণ ভারে অন্য একজন মানুষ জেগে উঠতে বাধ্য। গতকাল শেভ করা নীলাভ গালে মাত্র গালটা ঘষা দিতেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যে কোথায় চলে গেলাম বুঝতে পারলাম না। আমি ঠিক ওর নিচে ...।

চায়ের কাপের উত্তাপ সব ওর আঙুল থেকে সারা দেহে ছড়িয়ে দিয়েছি। ও এটাই চেয়েছিল এবং চুপচাপ উপভোগ করছিল। কয়েক মিনিট কি হলো জানি না। সম্পূর্ণ ওর আন্ডার কন্ট্রোলে। নিজের মধ্যে তখন আর আমাতে থাকতে দেয়নি দুষ্টটা আমাকে। ততোক্ষণে সাধের চা উত্তাপহীন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু এই চা আমাদের মুহুর্মুহ উত্তাপ দিয়ে চলছে ... চলবে ...।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

চায়নিজ

– জুয়েল

সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে পড়েছি, চায়ের উৎপত্তি চায়নায়। কিন্তু খোদ চায়নার লোকেরা কিভাবে এখন চা পান করে তা হয়তো অনেকে জানেন না। আমিও জানতাম না যদি না সে দেশে যেতাম।

চায়নায় ট্রেনিংয়ে গিয়েছিলাম। সাধারণত বিদেশে ট্রেনিং ক্লাসে চা কিংবা কফির ব্যবস্থা থাকে।

কিন্তু সে দেশে সে ব্যবস্থা নেই। তবে আছে গৃন টি। শুনে অনেকে ভাববেন এতে অসুবিধা কি হলো? এতো আরো ভালো জিনিস। কি রকম খাসা জিনিস একটু খেয়ে দেখবেন যদি সুযোগ পান। কষ কষ স্বাদ, তেতো আর বিজাতীয় গন্ধে ভরপুর এই বিখ্যাত চা। আমার কাছে তো প্রায় চিরতার মতো লেগেছে।

চায়নিজদের চা খাওয়ার পদ্ধতি একটু অন্য রকম। তারা একটি বহনযোগ্য প্লাস্টিক কিংবা স্টিলের তৈরি ফ্লাস্কের আকারের বোতলের মধ্যে তাদের ওই বিখ্যাত গৃন টি অল্প একটু নিয়ে পুরো বোতল গরম পানি পূর্ণ করে রেখে দেয়। একটু পর ওই পাতা থেকে সবুজাভ লিকার বের হয়। তারপর বোতল থেকে সরাসরি গলাধঃকরণ। নো মিল্ক, নো শুগার।

বোতলের মুখটি আকারে চায়ের পাত্রের মতো বড় হওয়াতে পান করতে অসুবিধা হয় না, আবার মুখের কাছে একটি ছাকনি থাকে যাতে চাপাতা পানের সময়ে মুখে না ঢুকে যায়। সারা দিন ওই তরল পদার্থ পান চলতে থাকে। যেখানে ওরা যায় সেখানে দেখবেন ওই বোতল বহন করতে আর একটু একটু চুমুক দিতে।

চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কোনো অসুবিধা নেই। লিকার শেষ হলে আবার গরম পানি পূর্ণ করে সারা দিন চলে ওই চা পান অথবা তরল পান।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

ibnulhossain@yahoo.com

নতুন ফ্লাস্ক

– ম. আলম

আমার বন্ধু শংকর রঙ চায়ের পোকা। পাচ মিনিট শেষ না হতেই এক কাপ চা লাগবেই তার। ঘরের চা থেকে দোকানের চা তার বেশি পছন্দ। বাড়ি থেকে দীর্ঘ পথ কাদা মাড়িয়ে দোকানে চলে যায় সে শুধু চা খাওয়ার জন্য।

একবার বৃষ্টির রাতে বাড়িতে চাপাতি না থাকায় ছাতা নিয়ে বের হতেই তার স্ত্রী বললো, এতো রাতে দোকান খোলা পাবে না।

হঠাৎ চোখে পড়লো গোলপাতার চালা থেকে রঙ চায়ের মতো পানি ঝরছে। কিছু পানি নিয়ে চুলায় উঠিয়ে দিয়ে চিনি মিশিয়ে খাওয়া শুরু করলো শংকর।

তার স্ত্রীর কাছে শুনেছি চাপাতি না থাকায় অনেকবার শুকনো কুমড়ো পাতা গরম পানিতে ডুবিয়ে রঙ চায়ের স্বাদ নিয়েছে সে।

বেড টি থেকে শুরু করে অসহ্য রকমের দুধ চায়ের নেশা আমার মেজখালার।

একবার আমাদের বাড়িতে এলে একটা বড় ফ্লাস্ক কিনে খালাকে বললাম, যখন ইচ্ছা তখনই চা খেতে পারবেন আপনি।

খালা আমাকে অবাক করে বললেন, বাপি, আমি তো ফ্লাস্কের চা খাই না। ওই চা নাকি স্বাস্থ্যসম্মত নয়, গন্ধ হয়ে যায়।

কি আর করা। আমাদের জুলিকে অর্ডার দেয়া হলো ক্ষণে ক্ষণে কাচা পাতি মেরে খালাকে চা দেয়ার জন্য।

যাবার সময় জুলিকে পাচশ টাকা বকশিশ দিয়েছিলেন খালা।

রাজশাহী, যশোর, খুলনায় সকাল দশটার আগেই ভালো রেস্টুরেন্টগুলোতে চা বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। চা খেতে হয় ফুটপাথের দোকানে দাড়িয়ে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের হোটেল, রেস্টুরেন্টে সব সময় চা পাওয়া যায়। আমার মতে, চট্টগ্রামের লোকজনই সবচেয়ে বেশি চা পানে অভ্যস্ত।

অনেককে দেখেছি ভাত খেয়ে বেসিনে যাবার আগেই বয়কে বলতে, *এই ভাইনে, চা ল উা।*

খাবার শেষে দই কিংবা কোক-পেপসির পরিবর্তে এক কাপ চা-ই চাটগাবাসীর পছন্দ। বিকেলে ঘন দুধের চায়ের সঙ্গে তেলে ভাজা পরাটা ডুবিয়ে খাওয়ার মজাই আলাদা, অন্য কোথাও যা দেখা যায় না।

এছাড়া চায়ে গরম পেয়াজি বা জিলাপি চুবিয়ে খাবার অভিজ্ঞতা আমার আছে।

সবাই জানেন, হোটেলে খাবার সময় মাছ মাংস শেষের দিকে বয়রা আরেকবার একটু ঝোল তরকারি নিয়ে আসে। কিন্তু চায়ের ঝোল দিতে কোথাও দেখেছেন?

হ্যা, চট্টগ্রামের ডিসি রোডে বাতেনের চা দোকানে চায়ের ঝোল পাবেন। তার দোকানের ক্রেতা হচ্ছি আমরা কিছু আড্ডাবাজ। এছাড়া রিকশা, ঠেলাগাড়ি চালকরা।

ওই দোকানে চায়ের সঙ্গে নাশতা হচ্ছে পিস করা পাউরুটি এবং বিভিন্ন সাইজের বনরুটি। এই নাশতা চায়ে ডুবিয়ে খেলে কাপে আর চা থাকে না।

অনেককে বলতে শুনেছি, এই একটু চায়ের ঝোল দে। বাতেনও কার্পণ্য করে না, কেটলি থেকে টুক করে একটু চা ঢেলে দেয় কাপে।

দাম দুই টাকাই।

এবার চা নিয়ে একটা কৌতুক বলে লেখা শেষ করছি।

রশিদ দেখতে কালো হলেও প্রচুর ইনকাম করে বলে বিয়ে করতে পেরেছে সুন্দরী নূরীকে। রশিদের কিছু মুদ্রাদোষ আছে যেমন প্রতিদিন পত্রিকায় রাশি দেখা। এছাড়া তার বদ্ধমূল ধারণা, যেহেতু সে কালো, সুতরাং

তার সন্তানও হবে কালো। কোন বইতে পড়েছে দিনের আলোতে স্বামী-স্ত্রীর মিলনে সন্তান জন্মে ধবধবে শাদা। তাই রাতের বেলায় নূরীর সঙ্গে ওই কাজ থেকে বিরত থাকলো রশিদ।

ক্লাস টেনে পড়ুয়া একমাত্র রূপসী শ্যালিকা শিল্পী রশিদের বাসায় থেকে পড়ালেখা করছে। রান্না-বান্না ইত্যাদি কাজের জন্য রশিদ ইতিমধ্যে তাদের গ্রামের বাড়িতে বড় হওয়া এতিম নাদুস-নুদুস উজ্জ্বল, ফর্শা চনা মিয়াকে নিয়ে এলো। চোদ্দ পনেরো বছরের চনা ঘরোয়া কাজে পারদর্শী। রশিদ প্রতিদিন অফিস থেকে এসে নূরীকে ডাক দেয় এই বলে, এই এসো, চা খাবো। অর্থাৎ চা খাবো হচ্ছে, ওই বিশেষ কাজের সাংকেতিক শব্দ।

নূরীও বুঝতে পেরে বেডরুমে ঢুকে দরজা লক করে। এদিকে চনা মিয়া ভাবে, প্রতিদিন দুপুরে দরজা বন্ধ করে ভাই-ভাবী কেমন চা খায়! চা তো সেই রেডি করে সকাল-বিকেল।

একদিন জানালার পর্দাকে কায়দা করে রাখলো যাতে চা খাওয়াটা সে লুকিয়ে দেখতে পায়।

পরদিন যথানিয়মে নূরীকে চা খাওয়ার কথা বলে দরজা আটকালো রশিদ। হাতের কাজ ফেলে চনা লুকিয়ে রশিদ-নূরীর চা খাওয়ার দৃশ্য দেখে পুলকিত হচ্ছিল। এক সময় সারা শরীরে প্রচণ্ড একটা শিহরণ অনুভব করলো সে।

স্নান শেষে শ্যালিকা শিল্পী চনার মাথায় টোকা দিয়ে বললো, এই লুকিয়ে কি দেখিস?

লজ্জা পেয়ে সরে দাড়ালো চনা।

শিল্পীও আপা-দুলাভাইয়ের চা খাওয়ায় রোমাঞ্চিত হচ্ছিল। বেশ মজা করেই দেখছিল সে।

উত্তেজনায় দিশেহারা চনা পেছন থেকে শিল্পীকে আকড়ে ধরে বললো, আফা, চলেন না আমরাও একটু চা খাই...।

মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল চঞ্চলা শিল্পীর শরীরে। সাড়া দিল সে!

দুজনেই ফ্লোরের ওপর আদিম খেলায় মগ্ন হলো।

রশিদ-নূরী দরজা খুলে আবিষ্কার করলো শিল্পীর বুকের ওপর চনা মিয়া হাপাচ্ছে। অর্থাৎ তাদেরও চা পান শেষ।

চুল ধরে টেনে উঠিয়ে রশিদ-নূরী বেদম প্রহার শুরু করলো চনাকে।

তার চিৎকারে অন্যান্য ফ্ল্যাটের মহিলারা জড়ো হয়ে জানতে চাইলে রশিদ একটা কথাই বার বার বলছিল, চোরের বাচ্চা, চুরি করে চা খেয়েছে...।

এক ভদ্র মহিলা বললেন, সামান্য চা খাওয়ার জন্য ছেলেটাকে মেরে ফেলবেন?

আরেকজন বললেন, আপনাদের পুলিশে দেয়া উচিত।

কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে রশিদ এবার বললো, দেখুন, চুরি করে চা খেয়েছে ভালো কথা। কিন্তু ইচ্ছা করে ফ্লোরে ফেলে নতুন ফ্লাস্কটা ভেঙে সর্বনাশ করলো কেন বদমাশটা?

খুলনা থেকে

পাকিস্তানে

– এ এন ওয়াহিদ

অনেক বছর আগে একটা বাংলা ছবি দেখেছিলাম সম্ভবত তা শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে করা হয়েছিল। তাতে একটা গান ছিল যার কথা অনেকটা এ রকম :

চায়ের পেয়ালা যদি সাগর হতো

সাতার কাটিতাম আমি মনের মতো।

আহা কি যে আরাম সে তো মনেই জানে,

চায়ের গন্ধ যেন মেজাজ আনে।

আমার জীবনে চা পানের প্লাটিনাম জুবিলী ইতিমধ্যে কেটে গেছে। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে পাকিস্তানের পেশোয়ারে ছিলাম। সেখানে পাঠানেরা দিনে প্রায় বিশ ত্রিশ কাপ চা পান করতো। এতে এফএম আইয়ুব খান একবার আফসোস করে বলেছিলেন, পাঠানদের জন্য আমরা চা বেশি রফতানি করতে পারছি না। তিনি তাদের কম চা পান করতে বলতেন। তাতে বিশেষ কাজ হয়নি।

আমিও লান্ডিকোটালে থাকাকালীন দিনে কমপক্ষে বিশ কাপ চা পান করতাম। তবে সব চা এক রকম ছিল না। দুধ, পাত্তি, কাওয়া, সিংগাপুরি ইত্যাদি নানান রকমের চা পানের প্রচলন ছিল।

পাঠানেরা আমাদের বলতো, *বাঙালি লোগ সব খাতা হ্যায়, চা বি*। অর্থাৎ বাঙালিরা চাসহ সব খায়। কিন্তু পানি যে পান করি তা বলতো না।

পেশোয়ারে অনেক হোটেলেই ভাঙা কাপে চা দেয়া হতো। একবার আমি প্রতিবাদ করায় এক হোটেল ম্যানেজার আমাকে একটা কারখানায় নিয়ে যায় সেখানে গিয়ে দেখলাম ভালো ভালো চায়ের কাপের তলা ভেঙে তাতে টিনের পাত লাগাচ্ছে যাতে করে চা গরম থাকে। ওখানে বেশির ভাগ চা কাপে না দিয়ে পটে দেয়া হয় যাকে *চানেক* বলে।

ঢাকা থেকে

কনে দেখা

– মোহাম্মদ কবির হোসেন

তুষার বিয়ে করবে। তাই আমাদের শহরের আনাচে–কানাচে চলছে মেয়ে দেখা অভিযান। অবশেষে এক সুন্দরীর সন্ধান পাওয়া গেল।

এখন আর বাড়িতে গিয়ে মেয়ে দেখে না কেউ। মার্কেটে এলে অথবা ঘুরতে গিয়ে আসার ছলে ছেলেকে দেখানো হয় মেয়েকে।

মেয়ে পরিবারের সঙ্গে কথা হলো। তারা মেয়েকে নিয়ে আমাদের কাপড়ের দোকানে আসবে।

ভোলা শহরে আমাদের কাপড়ের দোকানের বেশ সুনাম আছে।

বিকেলবেলা মেয়ে এলো, সঙ্গে তার বাবা। তুষারও একটু দূরে দাড়িয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে। মেয়ের বাবার সঙ্গে আলাপ জমালাম।

অন্য চেয়ারে বসে তুষার প্যান্টের পিস দেখছে। তুষার আমাকে ইশারায় ডেকে বললো, বন্ধু, মেয়ে তো এসেছে বোরখা পরে। এখন মুখ দেখার উপায়?

আমিও ভাবলাম, সত্যিই তো, এখন উপায়?

মেয়ের বাবার কানে কানে বললাম, মেয়ে দেখাতে এনেছেন বোরখা পরিয়ে। এখন কিভাবে মেয়ের মুখ ছেলে দেখবে?

মেয়ের বাবা বললেন, আমি তো মেয়েকে জানাইনি, কি কারণে মার্কেটে এনেছি।

হঠাৎ বুদ্ধি এলো আমার মাথায়। বাবুলকে সামনে দেখতে পেয়েই বললাম, বাবুল, দুই কাপ রঙ চা নিয়ে আয়।

চা নিয়ে এলো বাবুল।

বাবা ও মেয়ের দুই হাতে চায়ের কাপ তুলে দিলাম। মেয়ে প্রথমে খেতে চাইলো না।

বললাম, চা না খেলে ঠাণ্ডা কিছু?

শীতের দিনে ঠাণ্ডা? আপনি কি পাগল হয়েছেন? মেয়ের উত্তর।

তাহলে শীতের দিনে রঙ চা ভালো লাগবে। প্লিজ, খেয়ে নিন।

অবশেষে চা খাওয়ার জন্য মেয়েটি তার মুখের পর্দা সরালো।

আমরা সবাই অবাক হলাম। বোরখার আড়ালে এতো সুন্দর মুখ যে লুকিয়ে ছিল, আমরা ভাবতেই পারিনি।

মেয়েটি যতোক্ষণ চা খাচ্ছিল ততোক্ষণ তুষার শুধু মেয়েটিকেই দেখছিল। দেখা পর্ব শেষ হলে মেয়ে ও বাবা চলে যান।

তুষারের ভাব দেখে মনে হলো এখনই মেয়েটিকে বিয়ে করবে।

কয়েকদিন পরেই অবশ্য তুষার বিয়ে করে। এবং শাড়ি ও ব্লাউজের কাপড় কিনতে স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের দোকানে আসে।

তুষার স্ত্রীকে বলে, এর জন্যই সেদিন তোমার মুখ আমি দেখতে পেরেছি। ও যদি রঙ চা না আনতো তাহলে হয়তো তোমার সৌন্দর্য বোরখার আড়ালেই চাপা থাকতো।

কাপড় কেনা শেষে তুষার বললো, বন্ধু রঙ চা হবে?

না বন্ধু, আজ চায়ের দোকান বন্ধ।

তুষার হাসতে হাসতে বিদায় নিল।

পাকিজা স্টোর, ভোলা থেকে

নবমী

- এস কে নয়ন

ওর আর আমার বাড়ি প্রায় পাশাপাশি। তার নাম ছিল নবমী। কিন্তু তাকে ডাকতাম *ফুল* বলে। কারণ সে ছিল ফুলের মতো সুন্দর।

সে আমাকে ডাকতো কাটা বলে। ঘুমানো ছাড়া সব সময় তার সঙ্গে থাকতাম। তাতে কি?

একটা দিন ও আমাকে না দেখে থাকতে পারতো না।

আমিও তাই। কারণ দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসতাম। পারিবারিক দিক দিয়ে সবাই রাজি ছিল। তাই কোনো বাধা ছিল না।

সে যেমন ফুলের মতো সুন্দর ছিল তেমনি সুন্দর ছিল তার মন। চা বানাতে পারতো ঠিক তেমনি সুন্দর করে। আমার পরিবারের সবাই তার হাতের চায়ের জন্য এক কথায় পাগল ছিল। দিনে অন্তত একবার তার হাতের চা আমার চাই-ই চাই।

১৯৯৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। বারটা ঠিক মনে নেই।

সকালে ফুল আমাকে বললো, কাটা, কাল আমি মামাবাড়ি যাবো। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

তাকে বললাম, বাড়িতে বাজার করে দিয়ে আসি। তুমি আমার জন্য চা বানাও। এসে বলবো।

সে বললো, আচ্ছা।

বাজার করে আমাদের বাড়ির গেটে ঢোকার সময় কান্নার শব্দ শুনে বাজার রেখে দৌড়ে তাদের বাড়ি গেলাম। চা বানাতে গিয়ে এমনভাবে গায়ে আগুন লেগেছে যে, চেনা যায় না। হাসপাতালে নেয়া হলো। কথা বলতে পারে না। শুধু তাকিয়ে থাকে। পাচ দিন পর আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

তার হাতের চা-ই আমার জীবনের শেষ চা। এখন আর চা পান করি না।

আমার জীবনে কেউ আসেওনি।

কেরানীগঞ্জ, ঢাকা থেকে

ঘুম

– যুবরাজ সেলিম রাজ

প্রতিদিন পড়ার শেষে এক কাপ রঙ চা না খেলে আমার কিছুতেই ঘুম ধরে না। পড়তে পড়তে হঠাৎ ঘড়িতে চোখ পড়লো। দেখি অনেক রাত হয়ে গেছে। বাড়ির পাশে ছোট্ট একটি চায়ের দোকান। মনে হয় এতোক্ষণে বন্ধ করেছে। তাড়াতাড়ি দোকানে চা খেতে গেলাম।

গিয়ে দেখি যা ভেবেছি তা–ই। চায়ের দোকান বন্ধ। দোকান বন্ধ দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল।

আমাকে এক কাপ চা খেতেই হবে। তা না হলে আমার কিছুতেই ঘুম আসবে না। এক কাপ চা খাওয়ার জন্য ছুটলাম মধ্য রাতে বন্দরে।

বন্দরে গিয়ে দেখি সব চায়ের দোকান বন্ধ। হঠাৎ একটি দোকানে আলো দেখতে পেয়ে ত্বরিত গতিতে সেখানে উপস্থিত হলাম। দোকান বন্ধ করার জন্য গ্লাস, প্লেট ইত্যাদি গোছগাছ করছে।

ছেলেটিকে বললাম, এক কাপ চা হবে?

না, চায়ের লিকার শেষ হয়ে গেছে। আপনি এখন যান। আমি ঘুমাবো। ভোরে উঠে আবার দোকান খোলা হবে।

তোমার চোখে প্রচণ্ড ঘুম। চোখ দুটো বন্ধ করলেই ঘুম আসবে। কিন্তু আমার দু চোখে ঘুম নেই এক কাপ চায়ের জন্য। তুমি আমাকে চা খাওয়ালে বকশিস দেবো।

ছেলেটি আমার কথা শুনে অবাক হলো। আমাকে বললো, সত্যি কি আপনার চা না খেলে ঘুম ধরবে না?

তিন সত্যি।

ছেলেটি শুধু আমার জন্য এক কাপ রঙ চা তৈরি করে দিল।

প্রচণ্ড গরম চা এক চুমুকে খেয়ে ফেললাম।

আমার চায়ের নেশা কেটে গেল। এবং বাড়িতে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হারাগাছ, রংপুর থেকে

বিষ

ছোটবেলা পাচ ছয় বছর বয়সে চা খেতে চাইতাম মায়ের কাছে। কিন্তু মা চা না দিয়ে ওভালটিন দিতেন। চায়ের রঙ ও ওভালটিনের রঙ এক হওয়াতে বুঝতাম না যে, চা নয়, অন্য কিছু খাচ্ছি। যখন দশ বারো বছর বয়স, চা খেতে শিখলাম।

বয়স যতো বাড়ছে, চা খাওয়া বাড়ছে। পড়ার ফাকে ক্যাম্পাসের ক্যান্টিন অথবা রাস্তার ধারে চায়ের স্টলে চলতো চা সিগারেট খেতে খেতে ধুম আড্ডা।

প্রতিদিন বিকেলে বাসায় সবাই চা খেতাম এক সঙ্গে। চা বানাতেন বড় আপা। পিতৃহীন আমি ভালোবাসি সবচেয়ে বেশি বড় ও ছোট বোনকে। আমার প্রেমিকাকেও অতোটা ভালোবাসিনি যতোটা ভালোবাসি দুই বোনকে। সব সময় ভাবতাম আমিই তাদের সব, বাবার অবর্তমানে আমিই তাদের অভিভাবক।

রোজ বিকেলে আপার হাতের চা খেতে খেতে মা ও সব ভাইবোন শুরু করতাম আড্ডা। সন্ধ্যার পর বেরিয়ে যেতাম। রাতে ফিরে যখন গোসল করে বের হতাম, আপা চা নিয়ে আসতেন। একদিন জানতে পারি, আপার অ্যাফেয়ার আছে একটা ছেলের সঙ্গে। ছেলের নাম শুনেই হতবাক হই। আমাদের ক্যাম্পাসে ঢুকে মেয়েদের বিরক্ত করায় ওই ছেলেকে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে মেরেওছিলাম। তবু বিশ্বাস করিনি যে, আপার ওই ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। কেননা বোনদের প্রতি ছিল অগাধ বিশ্বাস ও প্রচণ্ড ভালোবাসা।

যখন কোনো মেলাতে বা শহরের বাইরে যেতাম তখন সঙ্গে প্রেমিকা থাকলেও প্রেমিকাকে কোনো কিছু কিনে দিইনি, বরং প্রেমিকার কাছ থেকে টাকা নিয়েও কিনেছি বোনদের জন্য উপহার। তাছাড়া আপা অনার্স পাস করেছেন কলেজে কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক হয়নি। ওই লুচ্চা ছেলেকে পাত্তা দেবেন এ কথা ভাবিনি।

একদিন সন্দেহবশত আপার মোবাইল খুজে একটা নাম্বার পাই যা H এভাবে সেভ করা। সন্দেহ আরো বাড়ে।

একদিন কলেজের সামনে ছেলেটাকে দেখে মাথায় বুদ্ধি আসে। তাই নিজের ফোন থেকে রিং দিই। কিন্তু ছেলেটা পকেট থেকে মোবাইল বের করে অথচ, রিং রিসিভ করে না। তখন নিশ্চিত হই যে, নিশ্চয়ই সে আমার নাম্বার জানে। তাই ফোন ধরছে না। এবং অবাক হই এই জন্য যে, এই নাম্বার মাত্র দুই দিন আগে নিয়েছি। সব বন্ধুরাও নাম্বার পায়নি এখনো। অথচ ওই ছেলে নাম্বার পেল কি করে?

কয়েকদিন ছেলেটাকে ফলো করি। একদিন সকালে কলেজে যাবার সময় রাস্তায় হঠাৎ মনে পড়ে যে, আজ বন্ধু রাসেলের সঙ্গে সেট পাল্টাবো। আমার সেট নকিয়া আর তারটা হলো মটোরলা। তাই অর্ধেক রাস্তা থেকে ফিরে আসি চার্জার নিতে। যেই বাসার সামনে আসি, দেখি ওই ছেলেটা বের হচ্ছে বিল্ডিং থেকে। প্রচণ্ড রাগ হলো।

আপাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম।

আপা বললেন, ওই ছেলেটা তাদের ব্যাচের ছাত্র। হঠাৎ সামনে দেখা হওয়াতে বাসায় চা খেতে নিয়ে এসেছেন।

জিজ্ঞাসা করি, তবে ছেলেটা আমার নাম্বার জানলো কিভাবে? এবং খুলে বলি আমাদের কলেজের ঘটনা।

আপা বলেন, তিনি ওসব কিছু জানেন না।

চলে এলাম বাসা থেকে। ওই থেকে আপা আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন।

প্রায় পনেরো বিশ দিন পরে বাসায় এসেছি হঠাৎ দুপুরবেলা। এই সময় আমি কখনোই বাসায় থাকি না বা ফিরি না।

আপা দরজা খুলে খুব হতবাক!

আমার রুমে যেতেই নাকে পারফিউমের গন্ধ পাই। এবং আমার রুমে একটা বেনসনের খোসা পাই যা অর্ধেক খাওয়া।

আপা ভেতরের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন।

আমি শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত বাসায় সে এসেছে। কেননা এই পারফিউম বাসায় কারো নেই আর আমি সিগারেট খাই গোল্ড লিফ।

আপার রুমে গিয়ে ডাকি তাকে।

আপা দরজা খোলেন না।

অনেকক্ষণ ডাকার পর দরজায় ধাক্কানো শুরু করলে এক সময় দরজা খোলেন।

ঘরে কাউকে না দেখে গিয়ে খাটের পাশে দাড়াই।

কি মনে হতে খাটের নিচে তাকাই। দেখি ছেলেটাকে। মাথায় যেন রক্ত উঠে পড়ে। ছেলেটাকে বের করে দুই তিনটা চড় মারি।

আপা কান্নাকাটি করে ওই ছেলেকে বাচান। এবং অনুরোধ করেন যেন মাকে না বলি। তিনি ওয়াদা করেন আর কখনো ওই ছেলের সঙ্গে মিশবেন না।

ছেড়ে দিই ছেলেটাকে।

এবং এটাই হয় আমার বড় ভুল।

দুই তিন মাস পর জানতে পারি তারা কোর্ট ম্যারেজ করছেন। দৌড়ে যাই বাধা দিতে।

কিন্তু রাস্তায় ওই ছেলের বন্ধুরা আমাকে অ্যাটাক করে। ভাগ্যিস আমার সঙ্গে বন্ধু রতন ছিল যে মার্শাল আর্টে ব্ল্যাকবেল্ট। আমিও তাই। তবু খালি হাতে দশ বারোজনের সঙ্গে লড়তে হয়েছে রাস্তার মাঝে অনেকক্ষণ। তিনটা স্ট্যাব হয় আমার হাতে আর বুকে।

ওই অবস্থায় রাস্তার লোকজন আমাকে নিয়ে যায় সদর হাসপাতালে।

কিন্তু আপা ওই ফাকে বিয়ে করে ফেলেছেন। সব কিছু জানাজানি হলো। মা ও চাচা-মামাদের কাছে রাতের বেলা আপু এবং ওই ছেলে পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইছেন। পরিবারের মানসম্মানের কথা চিন্তা করে ওনারা তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

তখন প্রশ্ন করলাম, ছেলে সম্পর্কে কিছু কি কেউ জানো তোমরা?

মা বললেন, ছেলে বলেছে, সে ভালো হয়ে গেছে। সে আর খারাপ কিছু করে না।

মামা বললেন, ছেলে সম্পর্কে খোজ নিয়েছেন, ছেলে সত্যিই ভালো।

মামাকে বললাম, ছেলের বাইরের চেহারা দেখেছো, ভেতরটা দেখোনি কেউ। আজ তার বন্ধুরাই আমাকে ও আমার বন্ধুকে রক্তাক্ত করেছে।

কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলেন না।

বছর খানেক বোনের সঙ্গে কথা বলিনি। এদিকে বোনের জন্য মনটা এতো বিষিয়ে উঠলো যে, নিজের প্রেমিকাকেও সময় দিতাম না। একদিন হঠাৎ আমার প্রেমিকার সঙ্গে ঝগড়া হলো আমার বাসায়। রাগের মাথায় বলি যে, আত্মহত্যা করবো। তখন বাসায় আপা ও তার স্বামী।

আমার প্রেমিকা চলে গেল।

সন্ধ্যার একটু আগে নিজেই কিচেনে গিয়ে চা তৈরি করে খাই। আপার স্বামী তখন কিচেনের দজার সামনে এসে বললো, চা খাচ্ছ নাকি?

কোনো কথা বলি না।

তিনি আবার বলেন, এই সন্ধ্যা ও রাতে ফিরে চা না খেলে তোমার কি খুব সমস্যা হয়? একদম রুটিন মতো, দেখি মিস হয় না।

চা নিয়ে নিজ রুমে ফিরে চা খেতে বসি। কিন্তু ভালো লাগে না। বেরিয়ে পড়ি। রাত বারোটার কিছু পরে ফিরি।

গোসল সেরে চা চড়িয়ে টিভিটা ছেড়ে বসি। একটু পরে চা নিজেই তৈরি করে নিজ রুমে এসে খাই। চা খাচ্ছি। তখন প্রেমিকা রীনার ফোন আসে। তার সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎ অনুভব করি গলা ও বুকটা পুড়ে যাচ্ছে। রীনার সঙ্গে কথা বলতে খুব কষ্ট হয়। বুঝতে পারি যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। হঠাৎ বমির আগে যেমন ঢেকুরের মতো ভেতর থেকে সব বেরিয়ে আসার জোগাড় হয় তেমনি হলো এবং মুখ দিয়ে রক্ত বের হলো।

রীনা ওপাশ থেকে চিৎকার করে বলছে, অনু, কি হলো, তুমি এমন করছো কেন?

তার চিৎকারে তার বাবা ছুটে আসেন এবং ওদিক থেকে জিজ্ঞাসা করেন, কি হয়েছে?

আমাদের বাসা থেকে এক ব্লক দূরে তাদের বাসা। রীনা ও তার বাবা দুজনে ছুটে আসেন আমাদের বাসায়। আর কিছুই মনে নেই।

প্রায় আটত্রিশ ঘণ্টা পরে নিজেকে হাসপাতালে আবিষ্কার করি। চেয়ে দেখি মা ও রীনা বসে আছেন।

মা তখন বলেন, তুই কেন আত্মহত্যা করতে বিষ খেলি? আমায় এভাবে কেন কষ্ট দিলি?

সব যখন বুঝলাম তখন আমি হতবাক। কেননা আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার মতো কাপুরুষ নই। বাবার অবর্তমানে সব মার্কেট ও বাড়ি দেখাশোনা করছি এবং পড়াও চালিয়ে যাচ্ছি গত পাচ বছর যাবৎ। কখনো আপোষ করিনি বা মাথা নোয়াইনি কোন কিছু সামনে।

প্রিয় পাঠক, বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই ওই দিন চায়ে কে এবং কেন বিষ দিয়েছিল? বাবার রেখে যাওয়া দুটি মার্কেট ও তিনটি বাড়ির জন্য।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

রোমান্টিক

– নিয়াজ মোহাম্মদ খান

এক.

রোমান্টিক চা

১৯৯৪ সাল। বিয়ের পরে প্রথম ট্রেন ভ্রমণ। বিয়ের এক মাস পরে চট্টগ্রাম যাচ্ছি হানিমুনে। বৌ কখনো ট্রেনে চড়েনি। সঙ্গে বোনেরাও যাচ্ছে। নতুন সঙ্গীকে জানালার বাইরে ছুটে চলা নতুন পৃথিবীকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

এক সময় সে বললো, বাথরুমে যাবো।

তাকে বাথরুমে নিয়ে গেলাম। বাথরুম থেকে বের হতেই বললাম, চলো হারিয়ে যাই।

সে ভীত কণ্ঠে বললো, কোথায়?

এই এখান থেকে সেখানে, হেটে হেটে যতোদূর যাওয়া যায়। আমাকে ভালোভাবে ধরো।

সে আমার কোমরের বেল্ট আকড়ে ধরলো।

আমি সামনে।

সে পেছনে।

ট্রেনের এক বগি থেকে অন্য বগি। কখনো পড়ে যাচ্ছে প্রায়, শক্ত করে ধরে ফেলছি। একটা বগির শেষে এসে থামলাম। সামনে অন্য বগির প্যাসেজ। একটু ফাকা জায়গা, কেউ নেই। দরজার বাইরে ছুটে চলা গাছপালা, প্রকৃতি। ট্রেনের লোকজন চা নিয়ে যাচ্ছিল। তাকে বললাম, চা খাবে? এক কাপ নিই?

সে বললো, এখানে তো ঠিক মতো দাড়াতেই পারছি না।

তবু এক কাপ চা নিলাম।

এক হাতে তাকে ধরে রেখেছি, এক হাতে চা। সে দুই হাত দিয়েই আমাকে ধরে রেখেছে ট্রেনের ঝাকুনিতে যাতে পড়ে না যায়। সুতরাং চা তাকে খাইয়ে দিতে হচ্ছে। সে এক চুমুক, আমি এক চুমুক।

মাঝে মধ্যে দুই একজন লোক চলতে চলতে আড় চোখে দেখে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে কেউ বিরক্ত, কেউ বিস্মিত।

সারা জীবনের সব চা যেন একাকার এক কাপে, সেই মুহূর্তে!

দুই.

ভুল চা

বাসার সবাই গেছে গ্রামের বাড়িতে। এখন সমবয়সী মামা, সময়বয়সী ভাইকে নিয়ে খালি ঘরে রান্নাবান্না করে খাচ্ছি। নিত্যনতুন রান্না হচ্ছে, নিত্যনতুন রেসিপি আবিষ্কৃত হচ্ছে।

সন্ধ্যের পরে মামা এসে বললেন, চা বানাও। দুধ চা বানাবে আজ।

বললাম, তুমি একটু পানিটা চুলোয় দিয়ে এসো।

কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম পানি ফুটছে, একটু ঘোলা। দুধ ঢেলে দিলাম। তারপরে চাপাতি, চিনি দিয়ে নামালাম। বড় কাপে বেশি করে নিলাম। স্বাধীনতার সময়ে একটু বেশি খাওয়াই ভালো। এই সুযোগ সব সময় থাকে না। আয়েশে টিভি দেখতে দেখতে কাপে চুমুক দিচ্ছিলাম। চা–টা বেশ হয়েছে। কিন্তু একটু কেমন লাগছে, একটু গন্ধ ...।

মামাকে বললাম, পানি ঠিকভাবে দিয়েছিলে?

তিনি বললেন, কেন? পানি তো চুলাতেই পাতিলে ছিল, আমি তো চুলা ধরিয়ে এসেছিলাম মাত্র।

খটকা লাগলো, চুলায় তো পানি ছিল না, তাহলে? হঠাৎ মনে পড়লো, সকালে বের হওয়ার আগে পাতিল ধুয়ে সেই পানি অন্য পাতিলে ঢেলে তাড়াহুড়া করে বেরিয়েছিলাম। নোংরা ঘোলাটে পানিটা ফেলানো হয়নি। তাহলে কি, তাহলে কি ...!

মামাকে খানিকটা বললাম এবং রান্নাঘরে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে নিশ্চিত হলাম যে, সেই নোংরা ময়লা পানিতেই আমাদের এই চমৎকার চা তৈরি হয়েছে, যা এতোক্ষণ আয়েশ করে শেষ করেছি।

এরপর ...? ঘরে অন্য দুজনের কাছে ব্যাপারটা চেপে গেলাম। নিজেদেরকে বমি ভাব থেকে সংবরণ করলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম এই *ভুল* চা-টা খুব ভালোই লেগেছে, আমাদের চা বানানোর হাতও বেশ চমৎকার। সুতরাং ফাইভ স্টার হোটেলওয়ালারা যোগাযোগ করতে পারবে নিশ্চিন্তে!

বাড্ডা, ঢাকা থেকে

সকাল বেলায়

- মাসুদ আখন্দ

চা আমার শৈশবের অভ্যাস। বাবা ছিলেন সেনা। রেশনের সঙ্গে চা, চিনি ও গুড়ো দুধ ছিল অবধারিত। আমাদের সকালের নাশতাটা ছিল পরোটা, আলু ভাজি এবং এক বিশাল মগ চা। মাসের প্রথম দিকে মা সাহস করে দুই চার দিন ডিম করে ফেলতেন। কিন্তু পাচ সন্তানের সংসার এক সেনা অফিসারের বেতনে যে প্রতিদিন ডিম, দুধ হয় না তা মনে পড়তেই আলু ভাজিতে ফিরে যেতেন। আমাদের সব ভাইবোনের একটা করে ছোটখাটো বালতি সাইজের হলুদ রঙের সরকারি আর্মি মগ ছিল।

প্রতিটা সকাল আমাদের শুরু হতো সেই মগ বালতির এক বালতি চা খেয়ে।

বাবার সেনা জীবনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল আমাদের বালতি মগ এবং হাতে এলো মহল্লার দোকানি নজিরকাকুর পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট কাপ। প্রথম দিকে তিন চার কাপ করে খেতে হতো। কিন্তু পরে ওই পিচ্চি কাপকেই বন্ধুর সঙ্গে ভাগাভাগি করতাম যেমনটি শেয়ার করতাম সিগারেট। অবশ্য আমাদের মধ্যে যাদের সারা জীবন কাশির অসুখ লেগে থাকতো আর সন্ধ্যার দিকে ইনডিয়ান কাশির ওষুধ না খেলে হতো না তাদের সঙ্গে শেয়ার করা যেতো না। কারণ তাদের চায়ে দুধ চিনির পরিমাণ এতো বেশি থাকতো যে, আর ওটা চা মনে হতো না, মধু মনে হতো।

আমি মনে হয় সেই মহা ভাগ্যবানদের একজন যার বাল্যকাল মহা আনন্দে কেটেছে। তখন মাত্র এরশাদের পতন হয়েছে। প্রথমবারের মতো নির্বাচন। দুই মাস পরেই এইচএসসি। কিন্তু সেদিকে আমাদের কারো কোনো খেয়াল নেই। আমরা মেতে রইলাম ধানের শীষ নিয়ে। সারা দিন নির্বাচনী অফিসে বসে থাকি আর প্রতি ঘণ্টায় ছয় সাত কাপ চা খাই।

ভাবটা এমন যেন নিজের পাস-ফেলের চেয়ে খালেদার পাস-ফেলটাই সবচেয়ে বড়। একদিন ধাম করে তারেক রহমানকে নিয়ে এলাম আমার ছোট মহল্লায়। বিশাল হই চই পড়ে গেল। বেড়ে গেল নজিরকাকুর চায়ের কাপের সংখ্যা। নজিরকাকু যদিও ঘোর আওয়ামী লীগার তবুও আমাদের জন্য চা বানাতে তার মমতার অভাব ছিল না। তার দোকানের টুলটাতে বসে, তার দোকানের চা খেয়েই তার সঙ্গে তর্ক করতাম জিয়া-মুজিবকে নিয়ে। আহা রে কি সেই মধুময় দিনগুলো!

সুইডেনে চায়ের প্রচলন নেই। যে দুই একজন চা খায় তাদের সঙ্গে চা খেয়ে দেখেছি, এই চা খাওয়ার চেয়ে ভাতের মাড় খাওয়া ভালো। সবাই তিতকুটে এক বিস্বাদ পানীয় কফি খায়। সময়ের সঙ্গে তাও খাওয়া

শিখলাম। তবুও চা ছাড়া আমার সকালগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছিল না। বাঙালি ছেলেরা রান্নার ব্যাপারে অর্কমার ধাড়ি। আমিও তাই। নিজের চাও করে খেতে পারি না। চা করতে গেলে যে জিনিসটা হয় তাকে আর যাই বলুন, চা বলা যায় না।

একদিন মা এলেন। এবং তার সঙ্গে আবার ফিরে এলো চা। কিন্তু চায়ের স্বাদটা ফিরে পাচ্ছিলাম না। কতো ধরনের চাপাতা আনলাম। কিন্তু সেই বাংলার চায়ের স্বাদ আর পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। বিখ্যাত ইংলিশ টি–ও মুখে দিলে ওয়াক থু করে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে।

এক বাঙালি ডাক্তার ভদ্রলোক তার ডাক্তারির পাশাপাশি বাংলাদেশের শাক–সবজি, মাছ, আচার, পান–সুপারিসহ যা সম্ভব বাংলাদেশের খাবার তার সবই নিয়ে সাজিয়েছেন এক ভ্যারাইটিজ স্টোর। কিন্তু নাম দিয়েছেন *ইনডিয়ান ফুড* (হায় রে, বাঙালি নিজের পরিচয়ে এতো কম আস্থা)! তার দোকানেই একদিন খুজে পেলাম বাংলাদেশের *ইস্পাহানি চা*। মনে হলো যেন আমি এতো দিন পরে আমার আত্মার খোরাক পেয়েছি, আমার দেশের চা। আমার বাংলাদেশের অমৃত ফিরে পেয়েছি।

ফিরে এলো চায়ের সকাল আবার আমার জীবনে। ততোদিনে মা দেখেশুনে তার মতোই চা বানাতে এক্সপার্ট এক শ্যামলা মেয়েকে পুত্রবধূ করে বাংলাদেশ থেকে নিলে এলেন সুইডেনে। প্রতিদিন সকালের প্রথম চুমুকটা দিয়ে মনে মনে বলি, না, সুইডেনটা ঠাণ্ডা দেশে হলেও বসবাসের জন্য খুব খারাপ না।

এখন প্রতিদিন বিকেলে যখন গিন্নি জিনিয়া চা করে দেয় আর মা বাবাকে নিয়ে বসি চা খেতে তখন আমাদের পাচ বছরের মেয়ে গহনাও দাবি করে তাকে চা দিতে হবে। সে চকোলেট ড্রিংক চায় না তখন মনে মনে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলি। আমাদের তিন মাসের ছেলে ঈশ্বরকেও মাঝে মধ্যে চায়ে ডোবানো আঙুল দিই তার মায়ের চোখ আড়াল করে। যদি কখনো জিনিয়া দেখে ফেলে তখন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে আর আমি না দেখার ভান করে উদাস চোখে অন্যদিকে চেয়ে থাকি।

সুইডেন থেকে

www.akhond.se

কাহন

- মারলিনা রায়

মায়ের মুখে শুনেছি, দেড় বছর থেকে আমার চায়ে হাতেখড়ি মেজচাচার বদৌলতে। তিনিই প্রথম আমার চামুখ করান। তখন থেকে নাকি এমনই হলো অবস্থা, চা দেখলেই ঝাপিয়ে পড়তাম। আর চা না দিলে প্রচণ্ড রাগে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলতাম।

অস্থির, উদ্বিগ্ন মা আমার চায়ের নেশা ছাড়াতে আড়াই বছর বয়সে গরম চায়ের কাপে আমাকে মুখ দিতে দিলেন যাতে গরম ছ্যাকা খেয়ে জীবনে আর ওমুখো না হই।

কিন্তু বিধির বাম। ছ্যাকা খেয়ে আরো পাকা হলাম। মায়ের মিশন বৃথা গেল। আমার ভালোবাসা আরো গভীর হলো।

আর আমার শাশুড়ির চা ভালোবাসা? সে তো আরো ভয়াবহ। আমার পাচ দিন বয়সী ছেলের হঠাৎ তীব্র ডায়ারিয়া হলো। সবাই ছুটলাম ডাক্তারের কাছে। স্টুল টেস্ট হলো।

কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না কিভাবে এটা হলো। গোপন তথ্য হঠাৎ ফাস হলো। ছোট বোন জানালো, আমার শাশুড়ি চায়ের গভীর ভালোবাসায় আমার চার দিনের শিশুর মুখে এক চামচ চা দিয়েছিল। তাহলেই বুঝুন কি ভয়াবহ চাপ্রেম!

আমি চা ছাড়া প্রায় কিছুই বুঝি না। গত দুই বছর আগে স্বামীর সঙ্গে ব্যাংকক গেলাম বেড়াতে। ব্যাগে চায়ের সরঞ্জাম নিতে ভুলিনি। হোটেলে ইলেকট্রক কেটলিতে চা বানাতাম। কয়েকদিন পর হঠাৎ আমার স্টক শেষ হলো। মাথায় বাজ পড়লো। কি করবো এখন?

হোটেলের কাছেই কানাবাজার ও গ্রোসারি ছিল।

দোকানে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই ইংরেজি বা ইশারায় অভিনয় করেও চায়ের কথা বোঝাতে পারলাম না। চার পাচটা দোকান ঘুরে ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন, বিধ্বস্ত হয়ে রাগে হঠাৎই বাংলা বললাম আরে ব্যাটা, চা চাই। চেয়ে দেখি দোকানির মুখে বত্রিশ দাতের বিস্তীর্ণ হাসি।

চাও চাও জাতীয় কি একটা বলে আমার হাতে একটা চায়ের প্যাকেট দিল।

এবার আমারও হাসি কান পর্যন্ত পৌছালো।

আরেকটা গল্প বলেই আমার চা কাহন শেষ করবো। তখন মেডিকাল কলেজের ছাত্রী। বান্ধবী আমরা ছয়জন। পরীক্ষা এলেই বেশি রাত জেগে পড়ার জন্য চা অনিবার্য। ওটা আমাদের এনার্জি অ্যান্ড অ্যান্টি সিডেটিভ ড্রিংক হিসেবে কাজ করতো। পরীক্ষা যতো কাছে আসছে, নাইট ফাইট বাড়ছে আর সঙ্গে চা পানও বাড়ছে।

ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক পাচ দিন আগে হাসপাতালে প্র্যাকটিকালের জন্য দুপুরে কারো ঘুম হয়নি। তাই রাতে প্রায় সবাই ক্লান্ত। রাত একটার সময় বানালাম আমাদের অ্যান্টি সিডেটিভ অ্যান্ড এনার্জি ড্রিংকটা।

সবাই হুজুরের পানি পড়ার মতো করে খেলাম যেন এক্ষুণি সবাই সতেজ হয়ে যাবে। কিন্তু হায়! চোখ মেলতেই দেখি ঘড়িতে রাত পৌনে চারটা। রুমের দরজা খোলা আর আমার পাচ বান্ধবী বিছানায় এলোপাতাড়ি পড়ে আছে। দেখে মনে হবে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পাক আর্মিদের মতো নির্দয়ভাবে তাদের কেউ ব্রাশফায়ার করেছে।

কেবল সেদিনই একটু রাগ হয়েছিল আমার ভালোবাসার ওপর, ও আমাদের সঙ্গে বেইমানি করার জন্য। মান-অভিমান যাই হোক, তবুও ভালোবাসি আমার ভালোবাসার চা-কে।

পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা থেকে

গেয়ো ভূত

– এসএম রুহুল আমিন

সেদিন ছিল শীতের মাঝামাঝি একটা সকাল। শীতে সকলের হাত পা থর থর করে কাপছে। সবাই ঘুম থেকে জেগে আমাদের পুকুর পাড়ে এসে রোদে বসে প্রতিদিন।

আমাদের একটা বড় কাঠের গুড়ি ছিল পুকুরের পানিতে। সেই কাঠটা তোলার জন্য দশ বারোজন লোক দড়ি দিয়ে বেধে তুলতে চেষ্টা করলাম। আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে কাঠটা পানির কিনার পর্যন্ত আনতে পারলাম। কিন্তু উপরে ওঠাতে পারলাম না। অবশেষে আরো লোকজন ডাকার জন্য চলে গেলাম পাশের বাড়িতে।

পাড়ার যতো শক্ত এবং কঠিন কাজ সবগুলো রফিক করে। সে খুবই গরিব মানুষ। পরের খেতে কাজ না করলে তার দিন চলে না। সব ধরনের কাজ সে করতে পারে। সেই জন্য তার কাজ কোনোদিন কামাই যায় না। গ্রামের লোকজন তাকে দিয়েই সব কাজ করাতে চায়। কারণ সে কাজ করে ভালো আর তাকে ডাকলেই সে যায়।

প্রথমেই তাকে পেয়ে গেলাম।

তাকে কাঠ তোলার কথা বলতেই সে রাজি হয়ে গেল। আমার সঙ্গে পুকুর পাড়ে চলে এলো। কাঠ দেখে আমাকে বললো, কি খাওয়াবে?

বললাম, চিনাটোলা বাজারে নিয়ে চা নাশতা করাবো।

সে তাতেই রাজি হয়ে গেল।

কাঠ তোলার জন্য নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই হাতে তালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানালো। কারণ এবার কাঠ উঠে যাবে। রফিক দড়ি ঠিকঠাক মতো বাধা আছে কি না এবং কাঠের চার পাশে ঘুরে দেখে সবাইকে পজিশন মতো ধরতে বলে এমন জোরে সবাইকে ধাক্কা দিতে বললো যে, এক ধাক্কাতেই কাঠ উঠে এলো।

চা যে কি জিনিস রফিক তা জানে না। শুধু নাম শুনেছে। চায়ের সম্পর্কে তার কোনো ধারণাও নেই। তবে সে অনেকের কাছে চা খাওয়ার গল্প শুনেছে। শহরের বাবুরা আসে গ্রামে বেড়াতে, তাদেরকে চা খাওয়ার জন্য পানি গরম করতে দেখেছে। কিন্তু সে কোনোদিন ছুয়েও দেখেনি চায়ের কাপ বা চায়ের কেটলি।

রফিকের ধারণা চায়ের অনেক দাম। চা খেতে গেলে অনেক টাকা পয়সা খরচ হয়। যাদের অনেক টাকা পয়সা আছে তারা ছাড়া আমাদের মতো খেটে খাওয়া অথবা পরের খেতে কাজ করা কুলি–মজুর, কৃষক–চাষা যারা, তারা চা খেতে পারে না।

রফিককে একদিন কাজি এমদাদুল হক–এর অদ্ভুত চাখোর গল্পটি শুনিয়েছিলাম। সে হা করে গল্পটি শুনেছিল। সবশেষে চা খেয়ে ভদ্রলোকের জন্য খুব দুঃখ এবং আফসোস করেছিল।

কাঠ তুলে স মিলে কাটানোর জন্য ভ্যানে তুলে পাঠিয়ে দিলাম। পরে আমি রফিককে সঙ্গে নিয়ে খাবো বলে রফিককে বললাম, জামা–কাপড় পরে আসতে।

অল্প সময়ের মধ্যে রফিক বাড়ি থেকে জামা গায়ে দিয়ে চলে এলো। জামার দুই জায়গায় ছেড়া, একটা পট্টিও মারা। একেবারে জীর্ণ–শীর্ণ অবস্থা। দেখে তাকে আমার একটা জামা দিলাম।

ও প্রথমে সেটা গায়ে দিতে আপত্তি করলেও আমার এবং বাড়ির সকলের পীড়াপীড়িতে গায়ে দিতে বাধ্য হলো।

তার স্বাস্থ্য–শরীর খুব ভালো বিধায় জামাটা গায়ে দেয়াতে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল। ফর্শা মানুষ, দাতগুলো ঝকঝকে পরিষ্কার।

আমরা ভ্যানে চড়ে চিনাটোলা বাজারে গেলাম। একটা ভালো হোটেল দেখে সেখানে ঢুকলাম।

বসেই রফিককে জিজ্ঞাসা করলাম, কি খাবে?

রফিক বললো, চা খাবো।

বললাম, আগে চা খেতে হয় না, আগে নাশতা খেতে হয়।

রফিক বললো, তুমি যা খেতে দেবে তা–ই খাবো।

প্রথমে রুটি এবং মিষ্টি দিতে বললাম।

বয় এসে রফিককে দুটি এবং আমাকে দুটি করে রুটি দুটি করে বড় মিষ্টি দিতে এলো। বয়কে রফিকের দিতে ইঙ্গিত করে বললাম এখানে দশটা রুটি, একটা ডিম এবং কিছু ডাল দিতে।

রফিক বাধা দিলে বললো, না, আর কিছু দিতে হবে না। আমি এতো খেতে পারবো না।

বললাম, তুমি আমাদের বাড়িতে পচিশটি রুটি খাও আর এখানে এসে অর্ধেক রুটিও খাবে না, তা কি হয়?

উত্তরে রফিক বললো, এখানে কি রুটি খাবার জন্য এসেছি? এখানে এসেছি চা–নাশতা খেতে। এখন যদি রুটি খেয়ে পেট ভরে ফেলি তাহলে নাশতা খেয়ে চা খেয়ে রাখবো কোথায়?

রফিকের কথা শুনে তো আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। গাধাটা বলে কি! ও তো কিছুই বোঝে না। এখানে তাকে নাশতা কারে কয়, বোঝানো যাবে না। বাড়িতে নিয়ে বোঝাতে হবে।

আশপাশে তাকিয়ে কেউ যেন শুনতে না পায় এভাবে ফিশ ফিশ করে তার কানে কানে বললাম, রফিকভাই, আজ আর নাশতা করা হবে না। আজ রুটি খেয়ে চলো বাড়ি যাই। আগামীকাল না হয় আবার আসবো আমরা।

রফিক কিছু বলতে যাবার উদ্যোগ নিতেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, কোনো কথা হবে না।

আমাদের একটু দূরে এক ভদ্রলোক নাশতা করছিল। তিনি ঘন ঘন আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। রফিকের কথা–বার্তা আমাকে খুব বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দিল। জীবনে কোনোদিন রফিক যে হোটেলে ঢোকেনি, সেদিন জেনেছিলাম।

রফিক আর কোনো কথা বললো না। রুটি খাওয়ার পর্ব শেষ করে বয়কে বললাম, আমাদের দুই কাপ চা দাও।

একটু পরেই বয় দুই কাপ চা এনে আমাদের টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই রফিক এক কাপ নিয়ে সবটুকু চা গাল হা করে একবারেই ঢেলে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গিলেও ফেললো। ফলে যা হবার তা–ই হলো। রফিকের জিভ, গাল, গলা সব পুড়ে গেল।

রফিক যন্ত্রণায় চিল্লা–ফাল্লা করতে লাগলো আর আমাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলো। আমার ওপর ক্ষেপে গিয়ে বললো, আমি গরিব মানুষ। তাই বলে তুই আমাকে গরম চা দিলি? বলে রাগে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দিলাম তাকে খেতে।

সে আর পানি খেলো না।

বললো, আমি তোমার দেয়া আর কিছুই খাবো না। বাড়ি গিয়ে তোমার মায়ের কাছে বিচার দেবো।

আমাদের কাণ্ড দেখে পাশের ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠে বললেন, *গেয়ো ভূত*।

রফিকের অবস্থা দেখে অন্য যারা ছিল সবাই হাসতে লাগলো, আমিও হাসি থামাতে পারলাম না। হাসতে হাসতে হোটেলের বিল শোধ করে রফিককে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে সব ঘটনা বলে ওষুধ নিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

বাড়ি এসেই রফিক আমার মায়ের কাছে সব ঘটনা বলে আমার মুণ্ডুপাত করার জন্য বিচার চাইলো।

তারপর চলে যাবার সময় আমার মাও হাসতে থাকলে তার রাগ আরো বেড়ে গেল।

গ্রামে এসে গ্রামের লোকজনের কাছে বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাকে *গেয়ো ভূত* বলে ডাকা শুরু করলো।

সেদিন থেকে তাকে আর আমরা রফিক বলে ডাকি না, গেয়ো ভূত বলেই ডাকি। এখন গেয়ো ভূত নামেই তার পরিচয়।

আজ রফিকের অনেক টাকা পয়সা হয়েছে। সমাজের অনেকের মধ্যে সেও একজন। তার এখন প্রতিদিন পাচ থেকে সাত কাপ চা না খেলে চলে না। তবে তাকে পাশের গ্রামের লোকজন গেয়ো ভূত নামে চেনে, রফিক নামে কেউ চেনে না। গেয়ো ভূত বললে রফিক রাগ করে না। ফলে সবাই তাকে সে নামেই ডাকে। অন্য কোনো নাম যে তার আছে সে কথা সে মনে করে না।

মনিরামপুর, যশোর থেকে

মৌরির উপদেশ

– আহমেদ শিবলী সাদিক কল্লোল

আমার অনেকগুলো খালাতো ভাইবোন! সংখ্যা ত্রিশের উপর। আমি যাদের খুব ভক্ত তারা সবাই চা খায়। কেমন খায় তার একটা নমুনা দিচ্ছি।

আমার বাবুভাই, যদিও তিনি এখন অনেক বড়। এবং খুবই বিরক্তিকর একজন ডাক্তার মেয়ে বিয়ে করেছেন, তিনি প্রতিদিন সত্তর থেকে নব্বই কাপ চা খান! তার চা খুব সাধারণ দুধ চা এবং তার চায়ের কাপ মিনি সাইজের।

এবার আসা যাক মাসুদ ভাইয়ার কাছে। তিনি যে চা খান তার নাম *চা চাপ্পি!* নামটা তারই দেয়া। আমি এই চায়ের নাম দিয়েছি *বিষ চা*। এই চা তিনি বানান এক টেবিল চামচ চাপাতা, এক গ্লাস পানির মধ্যে পাচ মিনিট জাল দিয়ে, উইদাউট এনি চিনি! এই চা খেলে নাড়ি–ভুড়ি পর্যন্ত তিতা হয়ে যায়। কিন্তু তিনি নির্বিকারভাবে এই চা খেয়ে যান!

আমার হুসন আপ্পি চা খান পাইপ দিয়ে, এমনভাবে খান যেন পেপসি খাচ্ছেন!

আমার চেয়ে ছোট এক বোন ঝিনুক। সে আরো জটিল মেয়ে। সে চা খায় বরফ দিয়ে। এতে নাকি টক–ঝাল–মিষ্টি আচারের মতো ঠাণ্ডা–গরম–মিষ্টির ককটেল টেস্ট পাওয়া যায়! আমি একদিন এই চা খেয়ে খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম।

আমার বোনদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক বোন হচ্ছে শিমু। তিনি চা খান শরবতের মতো। ঢক ঢক করে গরম চা খেয়ে ফেলেন! তিনি কিভাবে এতো গরম চা খেয়ে ফেলেন সেটা আমার কাছে আশ্চর্য!

আমি চা বানাতে পারি না। এটা মুনের কাছে প্রথম আশ্চর্য। চা বানাতে গেলে হয় একদমই রঙ হয় না, নয়তো ঘুটঘুটে কালো হয়ে মাসুদ ভাইয়ার চা চাপ্পি হয়ে যায়!

বাসায় কেউ চা করলে মাঝে মধ্যে বিপাকে পড়ে খাই।

বাজারের চা খাবো? প্রশ্নই আসে না। তারপরও একদিন পর পর তিন কাপ দোকানের চা খেয়েছিলাম।

২০০১–এর কথা। ঢাকায় পড়ালেখা করি। পরীক্ষার পর কলেজ ছুটি দিয়ে দিল। বাড়ি ফিরছি। রওনা দিয়েছি সন্ধ্যার দিকে। আটটার দিকে বাস গেল নষ্ট হয়ে। বাইরে কুকুর–বিড়াল টাইপ বৃষ্টি হচ্ছে। বাসের লোকরা ভিজে ভিজে বাস ঠিক করার চেষ্টা করছে।

বৃষ্টি একটু কমলে বাসের পেসেঞ্জাররা কাছের কিছু দোকানে গিয়ে উঠলো। আমিও তাদের সঙ্গে গেলাম। দেখতে দেখতে আবার বৃষ্টি বেড়ে গেল। আকাশ ভেজা, মাটি ভেজা, বাতাস যেন পেয়েছে মজা। ওই এলাকায় সম্ভবত ইলেকট্রিসিটি নেই। দোকানের কেরোসিনের কুপিগুলো দমকা বাতাসে হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু করেছে। দেখার মতো ব্যাপার।

হঠাৎ দেখি বেশ সুন্দর একটা মেয়ে বসে চা খাচ্ছে। একটা কথা বলে নিই। ছোট থেকে ঢাকার ফরিদাবাদ ব্যাংক কলোনিতে ছিলাম। প্রথম আম গাছে আম দেখি ক্লাস নাইনে। ঘটনাক্রমে আমাকে গ্রামে চলে আসতে হয়। কলেজে ওঠার পর একা ঘোরাফেরা করি।

যাহোক, ওই মেয়েকে ইমপ্রেস করার জন্য বৃষ্টিতে ভেজা শুরু করি। কিছুক্ষণ ভেজার পর বুঝতে পারলাম আমার জীবনের সবচেয়ে বোকামির একটা কাজ করে ফেলেছি। ঠাণ্ডার চোটে আমার চা দোকানের চুলার ভেতর ঢুকে যেতে ইচ্ছা করছিল। ঠক ঠক করে কাপছি।

কয়েকজন লোক আমাকে আমার বোকামির জন্য বেশ রসালো উপদেশ দিতে শুরু করলো। হঠাৎ মনে হলো মেয়েটা আমার দিকে এক পলকে তাকিয়ে আছে।

আমি তাকাতেই সে আমাকে হাতের ইশারা দিয়ে ডাকলো।

খুব বিব্রত বোধ নিয়ে কাছে গেলাম।

আমাকে সে বললো, কিছু মনে করবেন না, আপনি পর পর কয়েক কাপ চা খেয়ে ফেলেন। দেখবেন ঠাণ্ডা কম লগবে। সঙ্গে কাপড় থাকলে কাপড় বদলে ফেলুন।

এই কথা শুনে তো পুরোপুরি ভ্যাবলা বনে গেলাম। বলে কি মেয়ে! এই মেয়ের সামনে কাপড় পাল্টাবো? মরে গেলেও না।

আমার দ্বিধাময় মুখ দেখে মেয়েটা বললো, কিছু মনে করবেন না। আপনার মতো আমার এক ভাই আছে। আমার নাম মৌরি। আপনি বিনা সংকোচে আপনার কাজ করতে পারেন।

কিছুক্ষণ পরে অন্য লোকেরা আমাকে মৌরির কথা মতো কাজ করার জন্য উপদেশ দিল।

মৌরির কাছে গিয়ে বললাম, আপনি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন।

আমার এই কথা শুনে মৌরি ফিক করে হেসে ফেললো।

উফ, কি যে সুন্দর দেখালো তাকে! আপনাদের মরে গেলেও বোঝাতে পারবো না।

কাপড় পাল্টালাম। চা খেলাম পর পর তিন কাপ। কিছুটা আরাম বোধ করলাম। তারপর মৌরির সঙ্গে টুকটাক গল্প করলাম। বেশির ভাগই মিথ্যা কথা বললাম। আমার নাম বললাম ধ্রুব!

এক সময় বাসের ড্রাইভার এসে বললো, বাস ঠিক হবে না। তারা অন্য বাসের ব্যবস্থা করে দেবে।

অন্য বাসের ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমরা নেত্রকোনা চলে এলাম।

তিন কাপ চায়ের বিল মৌরি দিয়েছিল। আমি দিতে চেয়েছিলাম, সে নেয়নি। বলেছিল, অন্য একদিন যেন তাকে আমি চা খাওয়াই। তারপর তার কোনো খোজই পাইনি।

মৌরি তোমাকে বলছি, সেদিন তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তুমি এই লেখা যদি পড়ো প্লিজ, যাযাদি থেকে আমার ঠিকানা জোগাড় করে আমার সঙ্গে দেখা করো।

বারহাট্টা, নেত্রকোনা থেকে

বিস্বাদ

- জালাল উদ্দিন

মিলি ক্লাস এইটে বৃত্তি পেয়েছিল। নাইনে ওঠার পর থেকে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছিল। এসএসসি পরীক্ষা শেষ করার আগ পর্যন্ত ওকে নিয়ে কোথাও বের হইনি। শুধু চিঠিপত্র দেয়া-নেয়া হতো।

মিলির বান্ধবী ছিল ইশরাত। ইশরাতের কাছেই মিলির চিঠি দিতাম। মিলির কাছে স্কুল টাইমে চিঠি পৌছে দিতো ইশরাত। মিলি পরদিন ইশরাতের কাছে চিঠির উত্তর দিত। ইশরাত আমার কাছে মিলির চিঠি দিতো।

মিলিকে স্কুলে যাবার সময় বা ছুটির হওয়ার পর দেখে নিতাম। বৃহস্পতিবারের পরদিন শুক্রবার, স্কুল বন্ধ। তখন মনে হতো ইশ! যদি এমন হতো, শুক্রবার অন্য সব কিছু বন্ধ থাকলেও শুধু স্কুলটি খোলা থাকতো তাহলে খুব ভালো হতো। মিলিকে শুক্রবারেও দেখতে পারতাম তাহলে।

শুক্রবার জুমার নামাজ আদায় করে সময় কাটানো কষ্টকর হয়ে যেতো। অন্যান্য দিন তো আমি কলেজ থেকে একটার পর চলে এসে ফ্রেশ হয়ে মিলির আসার পথের কাছে থাকতাম। মিলির স্কুল ছুটি হতো বিকাল চারটায়।

প্রতি বছরে স্কুল বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। কখনো শবেবরাত, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি উপলক্ষে স্কুল বন্ধ হলে গায়ে জ্বালা ধরতো। কে যে এসব দিনে স্কুল বন্ধ দেয়ার নিয়ম চালু করেছিলেন! তিনি কি প্রেম করেননি? অবশ্য দুই ঈদে ইশরাতের সঙ্গে মিলি আমাদের বাড়িতে আসতো।

মিলির সঙ্গে রাস্তায় দাড়িয়ে কখনো কথা বলিনি। চিঠির মাধ্যমেই কথা হতো। ওর বান্ধবীর বড় ভাই বা বোনের বিয়ে হলে আমি ইশরাতকে নিয়ে যেতাম।

সেসব অনুষ্ঠানে মিলিও যেতো। তখন তার সঙ্গে কথা হতো।

অবশ্য মিলির ভয় থাকতো। কেউ যদি গল্প করতে দেখে ফেলে!

তাকে অভয় দিতাম।

মিলি তবুও ভয় পেতো।

মিলির কাছ থেকেই জেনেছিলাম, চা বাগান তার খুব পছন্দ। তার এক খালু চা বাগানের মালিক। সেখানে তারা বছরে একবার বেড়াতে যায়। প্রতি চিঠিতে না হোক প্রতি দশ দিন পর পর তার চিঠিতে চা বা চা বাগানের কথা উল্লেখ থাকতো।

মিলির এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টের পর মিলিকে চা গাছ দিয়ে বানানো একটি চায়ের টেবিল উপহার দিয়েছিলাম।

মিলি যে বেশ খুশি হয়েছিল তাও আমাকে জানিয়েছিল। অবশ্য মিলি তার বাড়িতে বলেছিল, সেই টেবিলটি ইশরাত তাকে উপহার দিয়েছে।

এসএসসি-তে পাস করার পর মিলি কলেজে ভর্তি হলো।

কলেজে ভর্তি হওয়ার পরদিনই আমরা ঠিক করেছিলাম চা বাগানে ঘুরে বেড়াবো।

২০০২ সালের ২৭ জানুয়ারি আমি ও মিলি চা বাগানে গেলাম। প্রথমে সাকেরা চা বাগান ও পরে রাজনগর চা বাগান-এ। চা বাগানের মাঝে মধ্যে ছায়া গাছ হিসেবে যেসব গাছ আছে সেসব গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে ছবি তুললাম। তবে সবই সিঙ্গল ছবি। দুজনের এক সঙ্গে ছবি তোলার জন্য তৃতীয় কাউকে নিয়ে যাইনি। গোলাপি ফ্রকে মিলিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

মিলির কাছ থেকেই জানতে পারলাম, এসব চা পাতার কুড়ি দিয়ে একটা ভর্তা তৈরি করা যায় যা খেলে তার স্বাদ জিভে লেগেই থাকে।

এসব চা পাতার ভর্তা বাগানের লোক ছাড়া অন্য কেউ তৈরি করলে সে রকম স্বাদ হয় না। চা বাগানের লোকরাই চা পাতার কুড়ি দিয়ে ভর্তা করলে শুধু সে ভর্তা দিয়ে পুরো পেট ভরে ভাত খাওয়া যায়।

মিলিই আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিল, আমি যেন কোনো একটা চা বাগানে ম্যানেজারের চাকরির আবেদন করি। তাহলে মিলি সারা জীবন চা বাগানের বাংলো-তে থাকতে পারবে।

কিন্তু আমি মিলির কথা রাখতে পারিনি। তবে মিলি ঠিকই এক চা বাগানের ম্যানেজারকে বিয়ে করে চা বাগানের বাংলোতে বসবাস করছে।

আমার কি হয়েছে তা বুঝতে পারি না। মিলির বিয়ের পরদিন থেকেই চা খেতে গিয়ে দুধ চা আমার কাছে তেতো লেগেছে। পরদিন... তার পরদিনও চা খেতে পারিনি। তেতো লেগেছে। সেই থেকে আমি কফি খাবার অভ্যাস করেছি। তৃষ্ণা পেলে আম কমলার জুস দিয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে ফেলি, অথবা কফি খাই।

এখন পিংকি তো শুধু আমার জন্য এক পট কফি কিনে রাখে। সে পট শেষ হলে নতুন আরেকটি পট কিনে রাখে।

অনেক দিন ধরে চা না খাওয়ার ফলে চায়ের স্বাদ কেমন তা ভুলে গেছি।

কামারকাপন, কদমহাটা, মৌলভীবাজার থেকে

বিল!

- সবুজ

আমাদের গ্রামের চায়ের দোকানে এক কাপ চায়ের দাম তিন টাকা।

একদিন শহরে গেলাম বেড়াতে। চা খাওয়ার সাধ হলো আমার। জিসি-র মোড়ে অনেক দামি দামি খাবারের দোকান আছে। তার মধ্যে আমি *বোনানজা* নামের হোটেলে ঢুকলাম।

হোটেলের বয় এসে আমাকে একটা বই দিল। বইটা অনেকক্ষণ পড়লাম। ওখানে কোনো চায়ের কথা উল্লেখ নেই।

বয়কে ডাকলাম আচ্ছা। এখানে সব কিছু লিখলো, চায়ের কথা কেন লেখেনি?

হোটেলের সব খাবারের চেয়ে চায়ের দাম কম তো, তাই চায়ের কথা লেখেনি।

না লিখলে লেখেনি। আমাকে এক কাপ চা দাও।

চা খাওয়ার পরে একটা কাগজে করে বিল আনলো। সেখানে বিল দেখি বায়ান্ন টাকা!

আমার মাথা ধরে গেল। বয়কে বলি, এতো টাকা কেন, আমি তো শুধু চা খেয়েছি। আর কিছু তো খাইনি।
আর কিছু না খেলে আপনি বিল দিয়ে চলে যান। না হয় টয়লেটে বেধে রাখবো।
বাধলে বাধবি, আমি বায়ান্ন টাকা দিতে পারবো না।
আমাকে টয়লেটে বেধে রাখলো প্রায় দুই ঘণ্টা।
চিন্তা ভাবনা করে একটা চিৎকার দিলাম।
বয় এসে টয়লেটের দরজা খুলে দিল।
চিৎকার কেন দিয়েছি জানেন? তখন বিদ্যুৎ চলে গিয়েছি, তাই। ভয় লাগার কারণে।
আমার কাছে একশ টাকা ছিল। তার মধ্যে বায়ান্ন টাকা বিল দিয়ে বাড়িতে চলে এলাম।
সে থেকে চিরজীবনের জন্য আমার চা খাওয়ার সাধ মিটে গেল।

বাশখালী, চট্টগ্রাম থেকে

ব্যবসা বিয়ে মেদ

- শেখ শাহেদ- উল- কালাম

বন্ধু শিপলু আর আমি এইচএসসি পরীক্ষার পর কোচিং করি *সানরাইজ*-এর উত্তরা, আজমপুর বাসস্ট্যান্ড শাখায়। সময়টা ১৯৯৪-এর সেপ্টেম্বর। দোতলা বাসার নিচ তলায় কোচিং সেন্টার, দোতলায় হস্টেল।
আমরা প্রায় ত্রিশজন থাকি হস্টেলে। কোচিংয়ের বিশাল পড়াশোনার চাপের জন্য একটু পর পর চা খাওয়া ছিল প্রায় রুটিনের মতো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, চা খেতে হলে বেশ খানিকটা হেটে আজমপুর বাজারে যেতে হয়। তাই হঠাৎই একদিন আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো, চায়ের ব্যবসা করলে কেমন হয়!
শিপলুর তুমুল উৎসাহে সেদিনই সব ব্যবস্থা করে ফেললাম।
চা, চিনি, ছাকনি আর গোটা দশেক শস্তা কাপ কিনে ফেললাম। শিপলুর ফ্লাস্ক আর হস্টেলের হাড়ি, সঙ্গে ফৃ গ্যাসের চুলা। শুরু হলো এস অ্যান্ড এস টি ব্রেক নামের টি স্টল।
বেশ কিছু বিজ্ঞাপন হাতে লিখে আমরা হস্টেলের রুমে রুমে সেটে দিলাম। দিনে তিনবার চার তৈরি হবে। সকাল নয়টা, বিকাল পাচটা আর রাত দশটা। লাল চা সোয়া এক টাকা এবং দুধ চা পৌনে দুই টাকা। খুচরা বাজারদর ছিল লালচা দেড় টাকা আর দুধ চা দুই টাকা।
হস্টেলের সবাই খুব উৎসাহ দিল। কারণ সময় সেভ ও অর্থ সাশ্রয়।
প্রথম দিনেই প্রায় একশ কাপ চা বিক্রি হলো। দ্বিতীয় দিন থেকে আমরা ফুল টাইম চা বিক্রি শুরু করলাম। যেহেতু গ্যাস ফৃ, তাই হাড়িতে পানি ফুটানোই থাকতো। শুধু মিক্সার করে সার্ভ করা। এভাবে আট দিন চলার পর আমাদের নেট লাভ হলো এক হাজার এক টাকা। কিন্তু ওই উইক-এর পরীক্ষায় দুজনেরই রেজাল্ট খুব খারাপ হলো। সাধারণত আমরা ভালোই করতাম সাপ্তাহিক পরীক্ষায়।
সুতরাং বাড়ির খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজে ইস্তফা দিয়ে আমরা পড়ালেখায় মনোযোগ দিলাম।

দুই.

বিয়ের জন্য কনে দেখতে গিয়েছি। সঙ্গে কিছু বন্ধু ও মুরুব্বি স্থানীয় কয়েকজন। বিভিন্ন কথা ও খাওয়া-দাওয়ার এক পর্যায়ে চা নিয়ে কনে মঞ্চে হাজির। সবাইকে চা দিয়ে সে মাথা নিচু করে লাজুক চাহনি দিয়ে মেঝের মোজাইক পর্যবেক্ষণ শুরু করলো।
সবার দৃষ্টি তার ওপর নিবন্ধ। টুকটাক কথার মাঝে সবার সঙ্গে আমিও চায়ের কাপ তুলে নিলাম হাতে। কিন্তু প্রথম চুমুক দিয়েই বেজায় বিষম খেলাম। এ তো চা নয়, আটলান্টিক মহাসাগরের গরম পানি। নোনা ও

লবণাক্ত। ভাবলাম হবু বরের সঙ্গে ফাজলামির সুযোগটা কন্যা পুরোপুরিই নিয়েছে। কিন্তু একে একে সবাই যখন বিষম খেলো তখন কনেকে দেখা বাদ দিয়ে পরস্পরকে দেখা শুরু হলো।

নীরব দৃষ্টিতে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছে, ভাই, তোমার চাও কি স্পেশাল কোয়ালিটির?

সবচেয়ে দেখার মতো হয়েছিল কন্যার পিতার চোখের চাহনি। না পারছেন সইতে, না পারছেন কিছু বলতে! এমন সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের বিয়েটা না জানি এক চায়ের জন্যই ভেস্তে যায়!

যাহোক, বিয়ে ভেস্তে গেল না। আমরা কনে পছন্দ করলাম। বিয়ে হলো ধুমধামের সঙ্গে।

বাসর রাতে আমার বৌকে প্রথম প্রশ্নটি ছিল সেদিনের আটলান্টিক স্পেশাল চা প্রসঙ্গে।

লাজুক হেসে সে বললো, তাদের রান্নাঘরে চিনি ও লবণ প্রায় একই রকম কৌটায় পাশাপাশি থাকে। ওই দিন টেনশনে সে গুলিয়ে ফেলেছিল।

কথাটি সত্যই মনে হয়েছে। কারণ আমার বৌয়ের চায়ের হাত আমার চেয়েও ভালো।

তবে পাঠক, এই ভুলটি থেকে আপনারা সাবধান থাকবেন, লবণ ও চিনির সহযাত্রিতা বর্জনীয়।

তিন.

চাকরিতে ঢোকার পর বেশ মুটিয়ে গিয়েছি। ব্যস্ততার কারণে ব্যায়াম বা খেলাধুলা করার সুযোগ হয় না। সারা দিন বৌয়ের খোটা হয় ওজন কমাও, না হলে রাতে ডিসটার্ব করবা না।

কাহাতক সহ্য হয়! প্যান্টগুলোও বিট্রে করা শুরু করেছে। সব ছোট হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎই একদিন এক বন্ধু খোজ দিল বায়োস্লিম চায়ের। দেশি তামাকের মতো পাতা, বিশ্রী গন্ধ, পাওয়া যায় শুধু ঢাকায়। অনেক কষ্ট করে এই বস্তু জোগাড় করলাম।

সকালে ও সন্ধ্যায় খালি পেটে এক কাপ করে দুই মাস খেলাম। আর অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, আমার ওজন আট কেজি কমেছে।

আমার মায়েরও মেদ-ভুড়ি সমস্যা। তাকে খেতে বললাম। ম্যাজিকের মতো তারও তিন মাসে প্রায় দশ কেজি ওজন কমেছে।

চাপা নয়। পাঠক, আপনারাও যাদের মেদ বেশি ট্রাই করে দেখতে পারেন।

এটি পাওয়া যায় ঢাকার শাহবাগ মোড়ে একটি ওষুধের দোকানে।

সতর্কবাণী :

বায়োস্লিম চা পানের আগে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

-যাযাদি

সুলতানপুর, সাতক্ষীরা থেকে

নির্বাচনী

- মুহম্মদ মফিজুল ইসলাম প্রিন্স

আমার দাদা মোহাম্মদ আবদুল ওহাব আওয়ামী লীগের নেতা। ভাকুর্তা ইউনিয়নের সভাপতি। সাভার থানাধীন ভাকুর্তা ইউনিয়নে একনাগাড়ে চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত।

১৯৮৪ সালে নির্বাচনের সময় আমি ক্লাস ফোরের ছাত্র। প্রচণ্ড শীত। দাদার দোয়াত-কলম মার্কা নির্বাচনী প্রচারণা তোড়জোড়ে চলছে। নির্বাচনী প্রচার শেষে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যরাসহ দাদা গভীর রাতে

বাসায় ফেরেন। নির্বাচনী আমেজে বাড়িতে লোকজনের জমজমাট আসর। চুলায় বিরাট পাতিলে খেজুরের গুড়ের *চা* হচ্ছে আর লোকজন টোস্ট বিস্কিট দিয়ে বিরামহীন চালাচ্ছে। সে এক হুলুস্থুল অবস্থা।

আমি তখন খুব ছোট। নির্বাচনী হালচাল তেমন বেশি বুঝতাম না এবং পোস্টারের প্রতি নেশা ছিল ভীষণ। তারপর রাতে চা খাওয়ার জন্য দাদার বাড়িতে যেতাম আমি আর আমার আরেক চাচাতো ভাই মোজাম্মেল হোসেন কচি।

আমরা তখন চা-এর কাপ পেলাম না প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে। তারপরও কচি বার বার চেষ্টা করতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত আমরা হেরে গেলাম। চা কাপ আমরা পেলাম না।

তখনো কচি অবশ্য হাল ছাড়েনি। সে শেষ চেষ্টা করছে খেজুরের গুড়ের চা খাওয়ার আশায়।

গ্রামীণ বাড়িতে রান্নাঘরের পাশে যে বিরাট পাত্রে পানি রাখা হয় তার নাম মটকা।

যা দিয়ে পানি ওঠানো হয়, গ্রামের ভাষায় আমরা তাকে *আইচা* বা *ছিপি* বলে থাকে। শেষে কচি সেই নারিকেলের ভাঙা আইচা নিয়ে এলো। সেই ছিপি দিয়ে আমরা দুজনে চা খাবো। সফল হলাম আমরা। এক ছিপি চা নিয়ে বাইরে এলাম। দুজনের মধ্যে আমি প্রথমে চা মুখে দিলাম। গরমে জিভ পুড়ে গেল।

কচি তারপর মুখে দিল ফু দিয়ে। মুখে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাচি আর কাশি শুরু হলো। আমারও একই অবস্থা। তারপর দুজনের চা খাওয়ার শেষে ঠাণ্ডা লেগে গেল। সেই সর্দি কাশি ছিল আমাদের দীর্ঘদিন। প্রায় তিন চার বছর আর সর্দি কাশি সারেনি।

ভার্কুতা, ঢাকা থেকে।

ববুর ছেলে

– একেএম আহসান উল্লাহ

দাদার বাড়ি ও বাবার চাকরি দুই-ই মফস্বলে। আমার বাবার একটা প্ল্যান ছিল যে, গ্রামে প্রচুর জমিজমা কিনে এবং সুন্দর একটা বাড়ি করে আজীবনের জন্য গ্রামেই থেকে যাবেন। কাজটা শুরু করেছিলেন বাড়ি করা দিয়ে। টাকা পয়সা যা ছিল তা দিয়ে বাড়ি করলেন, ফার্নিচার গড়ালেন। আর তা একাত্তরে পুড়ে ছাই হলো। আমরা শহর থেকে ফিরে নতুন বাড়ি পোড়া কয়লার ওপর রাত-দিন কাটাতে লাগলাম।

মা বলেছিলেন, আমরা এতোটাই নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে, মাঘের শীতে একটা ছেড়া কাথা জোগাড় করা যায়নি। রিলিফের টিন আসে। মাথার ওপর আকাশ ঢাকবেন এই আশা আমার বাবা বার বার করেছেন, অথচ রিলিফের টিন যতোবারই আসে ততোবারই চুরি হয়ে যায়।

অবশেষে কিছু পোড়া টিনের সঙ্গে আরো কিছু নতুন কিনে বাবা আবার দাড় করালেন একটি ঘর। আমাদের বাড়িতে মোট মিলিয়ে আটটা ঘর। মোক্তার আলীদের ঘরটা ছিল আমাদের ঘরের কাছে।

দৈনন্দিন অনটন কাটিয়ে উঠতে অনেক দিন চলে গেছে। সকালে নিয়মিত পানতা ভাত, কখনো আলুভর্তা, কখনো ডালভর্তা অথবা কলইশাক ভাজা দিয়ে খেয়ে স্কুলে যাওয়া। এই আমাদের নাশতা। আমাদের পাশের ঘরের মোক্তার আলীরা ওসব খায় না। তাদের ঘরের পাশে দুটি মাটির চুলা পাটখড়ি দিয়ে ঘেরাও করে বানানো *ওস্যা ঘর*-এ (বরিশালে পাক ঘরকে ওস্যা ঘর বলে)। নিত্যসকালে কিসের একটা আয়োজনের আমেজ পাওয়া যায়।

আমার ছোট বোন নাছিমা বললো, ছোট্ট (আমাকে ও ছোট্ট বলে ডাকে), ওরা রুটি খায় সরবত দিয়ে।

খাক গিয়ে।

মোক্তার আলী আর আমার বয়স প্রায় সমান। ও মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায় সারা দিন। অন্যের গাছ কাটে, বাচ্চা ছেলেদের মেরে বুক দাপিয়ে ঘরে ফেরে। ওর কোনো বিচার হয় না। বিচার দিতে কেউ এগিয়েও আসে

না। কালু মল্লিকের ছোট ছেলে তো! অথচ আমার স্কুলে যেতে হয়, পড়া করতে হয়, রাস্তায় কারো সঙ্গে ঝগড়া হলে মার খেয়ে আবার দ্বিতীয় দফা মার খেতাম ঝগড়া করতে যাওয়ার অপরাধে মায়ের হাতে।

একদিন আবিষ্কার করলাম, প্রতি সকালে তারা চা দিয়ে রুটি খায়, ওটা শরবত নয়। আমার মায়ের কাছে আবদার করলাম, আমরাও রুটি, চা খাবো।

আবদারে কাজ হলো না। আটা আসে না আমাদের ঘরে। আর চা খাওয়া একটি বিলাসিতা। তাও চলবে না এই অভাবের সংসারে।

কিন্তু কি করি! তাদের চা বানানোর আয়োজনে নিত্যভোরে আমার ঘুম ভাঙে। মনটা ওদের ওস্যা ঘরে পড়ে থাকে। আহা রে, মোক্তার আলী কতো ভাগ্যবান! সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চা খায়।

আমাদের স্কুলের পাশেই বাবুগঞ্জ বন্দর। এই বন্দরে সুবলের রেষ্টুরেন্টে বসে লোকদের আয়েশ করে চা খেতে দেখতাম। এই রকম বড়লোকদের মতো মোক্তার আলীরাও খায়।

মোক্তার আলীর মাকে আমরা ডাকতাম *ববু*। বাড়ির অনেকেই ববু বলে ডাকতেন। আমাদের এই ববু ছিলেন মোক্তার আলীর পচাত্তর বছর বয়স্ক পিতার চতুর্থ পত্নী।

ববুর বয়স ত্রিশের বেশি নয়।

একদিন সকালবেলা আমার মা আমাকে বললেন, যা তো তোর ববুর ঘরে গিয়ে ববুকে বল গাছ কাটার দা–টা দেতে।

আমি জানি এই দা খুব ধারালো হয় শীতের দিনে এই দা দিয়ে খেজুর গাছ কেটে রস বের করে। এবং মা এ দা দিয়েই কলইশাক পলবেন। এই শাক ভাজি খেয়েই আমরা স্কুলে যাবো।

এক দৌড়ে ববুর ওস্যা ঘরে গিয়ে হাজির।

ববু তখন ব্যস্ত। মাটির চুলোর মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে ফুক দিচ্ছেন।

ধুয়োর কুণ্ডলীর মধ্য থেকে মাথাটা তুলে ববু পিড়ি এগিয়ে দিয়ে বললেন, বয়।

আমি দাড়িয়েই তার নাশতার পসলা গোলানো আটা, চা পাতা ও কয়েক টুকরো আখের গুড় সাজানো দেখলাম।

ববুকে আমি বললাম কেন এসেছি।

ববু আবার বললেন, বয়, চা খেয়ে যাবি।

আমাদের ঘরের দিকে তাকাই আবার ববুর দিকে তাকাই।

গ্রামের বাড়িতে অতিরিক্ত কাপ থাকে না। হাতল ভাঙা একটি কাপ ববু কোত্থেকে উদ্ধার করে মাটি দিয়ে ধুয়ে আমাকে এক কাপ চা তুলে দিলেন। বললেন, আস্তে আস্তে খা। চা ধীরে ধীরে খাওয়ারই জিনিস।

আমিও তাদের মতো ফুক দিয়ে ধোয়া উড়িয়ে উড়িয়ে চা খেয়ে দা নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

এতোক্ষণ লাগে এইডা আনতে? মা রেগে আগুন।

ভাইবোনদের বলে বেড়ালাম, আজ চা খেয়ে এলাম। গ্রামের বাজারের চাপাতা আর আখের গুড়ের হাতল ভাঙা এক কাপ ভর্তি চা এতো তৃপ্তি দিতে পারে আমার জানা ছিল না।

মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, চা কি অনেক দামি জিনিস?

জানি না। মায়ের উত্তর।

আমরা গ্রাম ছেড়ে শহরে এলাম। বরিশাল শহর ছেড়ে ঢাকা এলাম। ঢাকা থেকে বরিশালেই খুব একটা যাওয়া হয় না, গ্রামে তো দূরের কথা। বরিশালে গেলে গ্রামের সবার কথা জানতে চাই। মোক্তার আলী একই গ্রামে ভাড়ায় একটি ভ্যান চালায়, বিয়ে করেছে, বাচ্চা হয়েছে। ভালো আছে।

অনেক বছরের ব্যবধানে বরিশালে যাই। যথানিয়মে সবার কথা জানতে চাই। আত্মীয়স্বজন, একে একে মোক্তার আলীর কথা, ববুর কথা।

মা বললেন, *বাবা, তোর ববু তো মারা গেছে, অনেক কষ্ট পাইছে রে, মোক্তার নাকি খাইতে দেতো না, কঠিন রোগে পাইছিল, একটা ট্যাবলেট নাকি মোক্তার কিন্যা দেয় নাই। ওকি মানুষ?*

মা চোখ মুছে বললেন, *আয় বাবা গোসল-টোসল কইরা নে। বাথরুমে তোয়ালে দিছি।*

ববু না খেয়ে মারা গেছে?

হ বাবা, বাড়ির সবাই তো কইলো।

সেই বাবুগঞ্জের চাদপাশার গণ্ডগ্রামের এক বৃদ্ধের যুবতী বধু, আমার ববু যিনি আমাকে জীবনে প্রথম চায়ের আস্বাদ দিয়েছিলেন, যার দিনটা শুরু হতো কি ঘটা করে চা বানানোর আয়োজনের মধ্য দিয়ে, এক কাপ চা পান করে সেই ববু বিধবা তো হলেনই আর মরে গেলেন খেতে না পেয়ে!

প্রায় পচিশ বছর হতে চললো সেই ববুর দেয়া হাতল ছাড়া এক কাপ চায়ের গন্ধ আমার স্মৃতিতে আজও তাজা। বিধাতা ববুকে তুমি শান্তিতে রাখো।

হংকং থেকে

akmahsanullah@gmail.com

সুন্দর কাপ

- স্বাতী আহমেদ

চা খাবার ইচ্ছে হয়েছিল ভারতেশ্বরী হোমসে। ছোটবেলায় যে দুই বছর ছিলাম ওখানে তার পুরোটা সময় ধরে প্রতিদিন সকালে নাশতার সময় চা খাবার খুব ইচ্ছা হতো। তখন আমরা ছোট বিধায় আমাদের দুধ খেতে দেয়া হতো আর চা ছিল বড় ক্লাসের মেয়েদের জন্য।

যাহোক, ওখানে কখনোই সে আশা পূর্ণ হয়নি।

ছেলেবেলায় দেখতাম বাবা খুব চা পান করেন। আমিও একটু বড় হয়েই চা খেতে শিখলাম। দুইবেলা চা তো চলতোই, অবেলায়ও চলতো। টেলিভিশনে বাংলা নাটক দেখতে দেখতে যখনই দেখতাম নাটকে কেউ চা খাচ্ছে, বাবা কাজের মানুষকে বলতেন চা করতে আর আমিও সেই চায়ের ভাগ পেতাম।

আমার চায়ের কাপটি ছিল সুপের কাপের মতো বড়। একবার আমার বড় খালা এসে সেই কাপ দেখে মহা বিস্মিত হলেন। এতোটুকু মেয়ে এতো বড় কাপে চা খাবে কেন?

তার কাছে আমি চিরকালই এতোটুকু। কিন্তু আমি তো তখন বড় হয়ে ওঠার জন্য কতো অদ্ভুত কাজই করতাম।

যাহোক, তিনি আমার ঢাউস কাপটি ভেঙে ফেললেন। তার বড় ছেলে তখন অস্ট্রেলিয়ায় অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেন। ছুটিতে দেশে আসার সময় অনেক কিছুর সঙ্গে বড় খালার জন্য একটি অতি সুদৃশ্য টি-সেট এনেছিলেন। বড় খালা সেই সেট থেকে আমাকে একটি চায়ের কাপ, পিরিচ দিয়ে দিলেন।

আমাকে আর পায় কে, কাপটির সৌন্দর্য দেখার জন্য আরো ঘন ঘন চা খেতে লাগলাম।

একবার আমার ভীষণ পেটে ব্যথা হলো। ডাক্তার দেখে জানালেন যে, গ্যাস্ট্রিকের ভাব। আমার তখন সব খাবারেই পেট জ্বলতো, চা খেলে রীতিমতো বমিভাব হতো। তাই ছেড়ে দিলাম। তবে অনেক পরে এক সময় কফি ধরলাম। সেটাও চায়ের মতো বাড়াবাড়ি পর্যায়ে এনে হঠাৎ ছেড়ে দিলাম।

হঠাৎ করে যে কোনো নেশাকর কিছু ছেড়ে দিতে আমার একটুও কষ্ট হয় না, বরং বেশ এক ভাব হয় যেন আমি এক মহা সংযমের অধিকারিনী। যখন চা কফি কোনোটারই নেশা নেই তখন একবার মহিলাদের এক পট লাক (Pot luck) পার্টিতে গেলাম প্যারাডাইস ভ্যালিতে এক বাঙালি বাসায়। এই পরিবারটি এবং এদের বাসা সম্বন্ধে একটু না বললেই নয়।

প্যারাডাইস ভ্যালি হলো অ্যারিজোনা স্টেটের মাঝে সবচেয়ে ধনী শহর। অতি উচ্চবিত্তদের বাস সেখানে। সেখানে এক বাঙালি পরিবার বাস করেন যারা স্বামী স্ত্রী দুজনেই অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। ভদ্রমহিলা অংকের প্রফেসর, তার স্বামী কেমিস্ট্রির। সেই পরিবারের মহিলাটি এখানে বাঙালিদের সবার আপা হন। অবশ্য সবার সঙ্গে তার ব্যবহার মা-খালা জাতীয় যা নাকি মুহূর্তে যে কোনো ব্যবধান ঘুচিয়ে আপন হতে দেয়। এই আপার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় অন্য এক বাঙালি বাসায় বার্থডে পার্টিতে গিয়ে। তিনি অতি পরিচিতের মতো আমায় তুমি বলে আলাপ শুরু করে পট লাকের নিমন্ত্রণ দিয়ে তা শেষ করলেন। আমিও নিমন্ত্রণ কবুল করলাম এবং পার্টির দিনটিতে আমার স্পেশাল মুড়িঘণ্ট রান্না করে নিয়ে গেলাম।

আপাদের গেটে আছে সিকিউরিটি ক্যামেরা আর কোড নাম্বার। আমাকে আগেই কোড নাম্বার বলে দিয়েছিলেন আপা। কোড নাম্বার পাঞ্চ করতেই গেট খুলে গেল। সেই গেট থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে বেশ ভেতরে। দুধারে সাজান গাছ, ঘাসফুলের বাগান ইত্যাদি পেরিয়ে যখন গাড়ি থামালাম, তাদের ম্যানশনের সামনে তখন সেখানে দেখি এক লোক দাড়িয়ে আছে ভ্যালে (Valet) পার্কিংয়ে। অর্থাৎ ওখানে আর নিজের গাড়ি পার্ক করার চিন্তা রইলো না। ভ্যালে এসে পার্ক করবে।

দরজায় আপা আমাকে স্বাগত জানালেন।

বেশির ভাগ অতিথিরা এসে গিয়েছিলেন, বাকিরা একে একে এলেন অল্প সময়ের মাঝেই।

মহিলাদের পার্টি বলেই হয়তো বা আপার স্বামীকে দেখা গেল না কোথাও। ফ্যামিলি রুমে আপার ছেলেমেয়ের ছবি দেখলাম। মেয়ে হার্ভাডে ডাক্তার আর ছেলেটি হাই স্কুলে সিনিয়র। আপার বাসার সব কিছুই অতি মনোহর এবং রুচির পরিচায়ক।

তার ডাইনিংরুমে বেজায় লম্বা খাবার টেবিলটি নাকি ইটালি থেকে আনা। সেটি এতো সুন্দর করে সাজানো যে, সেই সৌন্দর্য পট লাক পার্টিতে মহিলাদের নিয়ে আসা খাবারে কয়েক মাত্রা স্বাদ যোগ করলো।

বহুবিধ মুখরোচক খাবার শেষ হবার পর মহিলারা সবাই চা খেতে বসলেন। আমি খাই না জেনেও তারা আমায় মৃদু জোর করতে লাগলেন।

তাও রাজি হলাম না। ওমা যখন চা এলো তখন দেখি আমার সেই পরিচিত কাপ! সেই যে বড় খালা আমাকে দিয়েছিলেন ঠিক তেমন কাপ পিরিচ। আমি যেন মুহূর্তে টাইম ট্রাভেল করলাম, ফিরে গেলাম আমার টিনএজে। আহা, আমার নানা রঙের দিনগুলো! সেসব দিনের ছোয়া পাবার জন্যই যেন এক কাপ চা নিলাম। শুরু হলো দীর্ঘ যুগ পরে আবার চা খাওয়া।

smafamily@msn.com

গ্রামে শহরে

- লাল সাহেব

গাভীন চা। পঞ্চাশ বছর আগে গ্রামগঞ্জের বাজারে এই নামের চা পাওয়া গেলেও কেন গাভীন চা তা আজও অজানা রয়ে গেল। রাস্তার পাশে মাটির ছোট চুলাতে এ চা তৈরি হতো, পরিবেশন করা হতো টিনের বা কাচের গ্লাসে।

এ চা তৈরি করা হতো দুধ ছাড়া আদা ও তেজপাতা দিয়ে। প্রথম যেদিন রাস্তার পাশে বসে এক পয়সার এ চায়ের সঙ্গে এক পয়সা দামের কুকি বিস্কিট (ত্রিভুজ আকৃতি এবং লম্বা) খাই সেদিন যে তৃপ্তি পেয়েছি তা আজও ভুলতে পারিনি। এই চা দোকানেও পাওয়া যেতো। পরবর্তীকালে 'র'টি এর স্থান দখল করে নেয় যা আজ পর্যন্ত প্রিয় পানীয় হিসেবে চলছে।

গ্রামীণ জীবনে কিছু নেতৃস্থানীয় ও টাউট শ্রেণীর লোককে দেখেছি দুপুরের খাওয়ার সময় ছাড়া ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চা দোকানে আড্ডা দিতে দিতে, চা সাবাড় করতে। দিনে কতো কাপ চা খেতো তা হিসাবের বই ছাড়া উদ্ধার করা কঠিন ছিল। বাকিতে খাওয়া এই চায়ের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে জমি বন্ধক দেয়াসহ বিক্রি করতেও দেখেছি।

কাপ্তাইতে যখন কর্ণফুলি হাইড্রোইলেকট্রকের কাজ চলছিল তখন পাঠানদেরকে দেখেছি বড় বড় কাপ ভর্তি করে প্রচুর চিনি দিয়ে চা খেতে। একদিন বিকেলে বাবা ও তার সহকর্মীর সঙ্গে শহরের এক রেস্টুরেন্টে চা খেতে যাই। আমরা ভেতরের দিকের একটি টেবিলে বসেছি। আমি টেবিলের এক পাশে এবং বাবা ও তার সহকর্মী অপর পাশে। দুজনেই শাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরা।

আমরা নাশতার পর চা খাচ্ছি। ঠিক ওই সময় সামনের টেবিলে এক পাঠান চা-তে চিনি কম হয়েছে বলে চিৎকার দিচ্ছে। বয় যথেষ্ট চিনি দিয়েছে বলে যতোই বোঝাতে চাচ্ছে, পাঠান ততোই চিৎকার দিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে।

এবার বয়ও ক্ষিপ্ত হয়ে চায়ের কাপের সমান এক কাপ চিনি চার কাপে ঢেলে দেয়, সব চা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে মহা হট্টোগোল বেধে যায়।

এ দৃশ্য দেখে দম ফাটা হাসিতে আমার মুখের সমস্ত চা বাবা ও তার সহকর্মীর বুকে, মুখে গিয়ে পড়ে। বাবার লাল চোখের দিকে তাকিয়ে দিই দৌড় বাসে চড়ে, পৌছাই বাড়িতে। ঘটনাটি আজও মাঝে মধ্যে আমাকে হাসির মধ্যে ফেলে দেয়।

কলেজে পড়ার সময় এক বন্ধুকে দেখতে তার পিতা শহরে আসেন। সে তার পিতাকে নিয়ে স্টেশন রোডে অবস্থিত বিখ্যাত-কুখ্যাত হাসমত রেস্টুরেন্টে যায় চা নাশতা খেতে।

চা পরিবেশনের সময় একটা রেওয়াজ বা নিয়ম আছে যে, চামচও দিতে হয় চিনি নিয়ে নাড়ার জন্য। কিন্তু এখানে বয় চা দিয়েছে, চামচ দেয়নি।

তখন ম্যানেজারের পাশের টেবিলে বসা বন্ধু চামচের ব্যাপারে ম্যানেজার হাসমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার হাসমত চেচিয়ে বলতে থাকে, *এই হালার পুত চা দিয়েছিস তো, চামচ দেসনি ক্যান? নুনু দিয়ে চা নাড়বে নাকি?*

ম্যানেজারের আচরণে বন্ধু লজ্জিত হয়ে পড়ে। পরে ঘটনাটি আমাকে বলে।

এক গরিব বন্ধুর চাকরিটা যেন হয় এ জন্য দোয়া-দরুদ পড়ছিলাম আর যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছে তাদেরকে কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে তা জেনে নিচ্ছিলাম। দেখি একটা কমন প্রশ্ন সকলকে জিজ্ঞাসা করছে, সিলেটের চা ভালো, না হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের (বর্তমানের শেরাটন) চা ভালো।

পাতা হলে সিলেটের চা ভালো আর তৈরি চা হলে ইন্টারকন্টিনেন্টালের চা ভালো বন্ধুকে বলে দেয়া এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের সভাপতি দাড়িয়ে তার সঙ্গে করদর্মন করেন এবং একটি মাত্র উত্তরের জন্য চাকরি হয়ে গেছে বলে জানান।

সেদিনের এই ঘটনায় মহাখুশি হলেও ওই বন্ধুর পরিচয় এখন জানা নেই।

ছাত্র জীবনে সকাল বিকেল দুই কাপ 'র'টি খেতাম। ইউনিভার্সিটি জীবনেও সে অভ্যাস ছিল। একদিন ম্যানেজার বললো লেবু পাওয়া যায়নি তো, 'র'টি দেয়া যাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে গেলাম এবং শালার বেটা বলে গালি দিয়ে লেবুর ব্যবস্থা করতে বললাম, না হয় পরদিন ক্যান্টিন বন্ধ করে দেবো বলে হুমকি দিলাম।

আমি কোনো রাজনীতি করতাম না, ক্যাম্পাসে ভদ্র ছেলে বলে পরিচিত ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার এ আচরণে ম্যানেজার দারুণ মর্মাহত হলেন।

ক্যাম্পাস থেকে আমার বিদায়ের আগের দিন বিকেলে ম্যানেজার নিমন্ত্রণ জানালেন ক্যান্টিনে।

গিয়ে দেখি ক্যান্টিন ভর্তি হলের ছেলেরা দাড়িয়ে আর আমার জন্য শুধু একখানা টেবিল চেয়ার এবং এক কাপ ‘র’টি। ঘটনায় হতবাক হয়ে যাই।

ম্যানেজার পূর্ব ঘটনার জের টেনে বিদায় জানাতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

বিষয়টি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

মিরপুর, ঢাকা থেকে